চরিতাষ্টক।

শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৬ সাল।

প্রথম বারে মুদ্রিত........................১০০০

দ্বিতীয় বারে মুদ্রিত........................২০০০

তৃতীয় বারে মুদ্রিত........................২০০০

চতুর্থ বারে মুদ্রিত........................২০৫০

নিবেদন।

মদীয়াধ্যাপক পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহোদয়ের মহিমান্বিত নামে

প্রথম

চরিতাষ্টক

উৎসর্গীকৃত হইল।

বিজ্ঞাপন।

প্রথম মুদ্রাঙ্কণ কালে পাণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের সংশোধন করিয়া দেন। আমি তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। ১২৭৪ সালে ইহা প্রথম মুদ্রিত হইয়া অনেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয়; তজ্জন্য অনতি বিলম্বে সহস্র পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় এই পুস্তক দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কণের প্রয়োজন হয়।

১২৭৬ সালে প্রথম চরিতাষ্টক দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় বারে, উহার অনেক স্থল সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারের মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষিতপ্রায় হওয়ায়, ১২৮১ সালে তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল।

এবার, প্রথম চরিতাষ্টকের অনেক স্থল সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বারে, মুদ্রাগত যে সকল দোষ ছিল, তৎপরিহারার্থে এবার সবিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। এই পুস্তক খানি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ হালদার অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন; তাহাতে আমি তাঁহার নিকট বিশেষ বাধিত হইয়াছি।

কোন বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে, তদ্বিষয়ে অন্যের অভিপ্রায় কি, সকলেকেই প্রায় অনুসন্ধান করিতে

দেখা যায়। স্বদেশীয় প্রধান লোকের জীবন-চরিত পাঠ, আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কি না? যাঁহারা এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের সাহায্যার্থ, চরিতাষ্টকসম্বন্ধে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়ের সার, পত্রান্তরে সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

পরিশেষে সাধারণ সমীপে বিজ্ঞাপন এই যে,—নানা স্থান ভ্রমণ,—প্রাচীন কীর্ত্তি ও চিহ্নাদি পর্য্যবেক্ষণ,—জীবনবৃত্ত সংক্রান্ত গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও পুস্তিকাদি পাঠ, —প্রাচীনগণের প্রমুখাৎ শ্রুত বিবরণ,—প্রচলিত কিম্বদন্তী পরম্পরার সমন্বয়, ইত্যাদি দ্বারাই চরিতাষ্টক লিখিত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রাপেক্ষা ইতিহাসেই অধিক ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা। আমার চরিতাষ্টকও ইতিহাসমূলক গ্রন্থ, অতএব ভরসা করি, ইহাতে কোন ভ্রম লক্ষিত হইলে, যদি অনুগ্রহ করিয়া কেহ জ্ঞাপন করেন, বিশেষ বাধিত হইব।

রাণাঘাট,
১লা আশ্বিন,
১২৮১ সাল।

শ্রীকালীময় ঘটক।

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন।

এবারেও প্রথম চরিতাষ্টক অনেক স্থলে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

উত্তর বরাহনগর বঙ্গবিদ্যালয়
১৫ চৈত্র ১২৮৬।

শ্রীকালীময় ঘটক।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

"---The author announces it to be the first of a series, which we trust will be followed up with speed.—If the heads of Education Department encourage the production of such useful works as the one under notice, they will be making some return for the vast sums which are annually spent upon their useless and sometimes mischievous supervision.—This book may fitly be introduced in our schools. Bengal is not rich in great men, but our youths ought to know the lives of the few we have had."

Hindu Patriot, April 27, 1868. January 12, 1874.

"—কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেরই কর্ত্তৃক এই পুস্তক আদরের সহিত পঠিত হওয়া উচিত।—এই পুস্তক পড়িতে আমাদের এত কৌতূহল হয় যে, উহা হস্তগত হইবামাত্র পাঠ না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

—চরিতাষ্টক পাঠ যে, বাঙ্গালী ছাত্রের বিশেষ উপকার জনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।—"

অমৃতবাজার পত্রিকা ১০ই অগ্রহায়ণ,

১২৭৭। ২৫এ পৌষ, ১২৮০।

"—মহাত্ম-গণের জীবনচরিত পাঠ করা পরম প্রীতিকর ও উপদেশজনক। কোন মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিলে, তাঁহার অবলম্বিত কার্য্যপ্রণালীর অনুকরণ করিতে অভিলাষ জন্মে।—"

"—আমাদের এমনি এক বিষম রোগ জন্মিয়াছে যে, আমরা স্বদেশীয় মহাত্মগণের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া, বিদেশীয়গণের জীবনচরিত অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। যদি গ্রন্থকারগণ ইহা না করিয়া, স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের গুণ-প্রকটনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের শ্রম সার্থক হয়।—"

সোমপ্রকাশ, ২৫এ চৈত্র ১২৭৪।

"—আমরা যেরূপ যত্নের সহিত (চরিতাষ্টক) পাঠ করিয়াছি, পাঠান্তে যে, তদ্রূপ পরিতুষ্ট হইয়াছি, তাহা বলা বাহুল্য। বিদেশীয়গণের জীবনচরিত পাঠাপেক্ষা এতদ্দেশীয় মহাত্মগণের জীবনচরিত যে, বাঙ্গালী বালকের অবশ্য পাঠ্য এবং অত্যুপকারী, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না।—"

হালিসহর পত্রিকা, ২৯এ চৈত্র ১২৮০।

"—এতদ্দেশীয় মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনবৃত্ত পাঠে, আমাদের যত আনন্দ হইবার সম্ভাবনা, অপর দেশীয় লোকের জীবনচরিত পাঠে তত হইতে পারে না। এই জন্যই চরিতাষ্টক আমাদের বিশেষ আদরের সামগ্রী।—ইহার রচনা অতি উত্তম হইয়াছে এবং উহা বালকদিগেরও বিলক্ষণ পাঠোপযোগী, তাহার সন্দেহ নাই।—"

এডুকেশন গেজেট, ৬ই আষাঢ়, ১২৮১।

"—(গ্রন্থকার) বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী মহৎ অভাব পূরণ করিয়া দিতে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা দেশীয় মহাত্মগণের জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার কৃত চরিতাষ্টক, আমরা আদরের সহিত পাঠ করিলাম। চরিতাষ্টক পুস্তক বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট বড় আদরের সামগ্রী হইবে।"

"——মৃত ব্যক্তির সৎকীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিয়া জীবিতদিগকে সৎকর্ম্মে উৎসাহিত এবং কৃতজ্ঞতা বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনই জীবন-চরিতের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ হইলে বিশেষ ফল হওয়ার সম্ভাবনা।—ব্যক্তি সাধারণের আত্মোন্নতিপক্ষে জীবনচরিত পাঠের ন্যায় অন্য কোন বিষয়ই তাদৃশ কার্য্যকারী হয় না।—জীবনচরিত পাঠে উপকৃত নহেন, এরূপ লোক কোথায় দেখা যায়? বঙ্গভাষায়, দেশীয় লোকদিগের জীবনচরিত ধারাবাহিকরূপে লেখার এই প্রথম উদ্যম। তজ্জন্য কালীময় বাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।—"

জ্ঞানাঙ্কুর। শ্রাবণ, ১২৮১।

"—আমাদের মতে "চরিতাষ্টক" অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক হইয়াছে। আমি চারি বৎসরাবধি ঐ পুস্তক আপন বিভাগে চালাইতেছি এবং আমার একান্ত বাসনা ও ভরসা যে, পুস্তক খানি অন্যান্য বিভাগে প্রচারিত হয়।—"

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।
৪ঠা জুন, ১৮৭২।

"—এদেশের বালকগণ, বিদেশীয়গণের জীবনচরিত কল্পিত গল্পসদৃশ মনে করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় চরিতাষ্টক বিশেষ আবশ্যক ও ফলোপধায়ী হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।—আমাদের অনুরোধ, গ্রন্থকার ক্রমশঃ এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন।—"

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস M. A., B. L.
৫ই এপ্রিল, ১৮৭·

"—দেশের মাহাত্মগণের জীবনবৃত্ত সংক্রান্ত পুস্তকের সম্পূর্ণ অভাব আছে, চরিতাষ্টক দ্বারা সেই অভাবের কতক দূর পূরণ হইয়াছে।"

শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন।
২৪এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯।

"——Charitashtaka is the first book of its kind. It is, I must confess a valuable acquisition to our literary library. It is indeed a book which should have a place in the curriculum of studies of every school, English as well as Vernacular, and in the library of every gentleman."

মৃত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়
Deputy Inspector of Schools, Calcutta.

"——The book is full of interest. Such works are really useful and instructive and deserve every encouragement. They are really valuable addition to literature."
Indian Mirror, January 19, 1874.

"——I spent a few pleasant hours in going over this book.——With anecdotes at once pleasing and instructive. ——The book must be regarded as a good publication and worthy of patronage of the Public."

মধ্য বিভাগের স্কুল সমূহের শ্রীযুক্ত ইন্স্পেক্টর সাহেবের প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিকলিখিত পত্র। নং ৫৪।
৭ জুন, ১৭৬৮।

সূচী।

পৃষ্ঠা

প্রথম

চরিতাষ্টক।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

ইনি, নবাব মুরশিদ্‌কুলি খাঁর অধিকার সময়ে ১১১৭ সালে (১৭১০খৃঃ) কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ন্যূনাধিক ৭৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম রাজা রঘুরাম রায়। যশোহরের অন্তর্গত হাবিলি পরগণার কাঁকদি গ্রামে ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস। সম্রাট্ আকবর সাহের সময়ে ঢাকার নবাবের উপদ্রবে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষ কাশীনাথ রায় জন্মভূমি কাঁকদি ত্যাগ করিয়া এই দেশে আগমন করেন এবং নদীয়া জেলার বাগোয়ান পরগণার বল্লভপুর গ্রামে ঐ পরগণার জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। কাশীনাথের পৌত্র ভবানন্দ রায়, বাঙ্গলার নবাব মানসিংহ ও সম্রাট্ জাহাঙ্গিরের অনুগ্রহে বাগোয়ান প্রভৃতি কয়েক পরগ-ণার জমিদারী পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোপাল রায় রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। পরে নানা উপায়ে আরও

উন্নতি হওয়াতে রাজা রঘুরামের সময়ে এই বংশ বঙ্গদেশের মধ্যে মহা সম্ভ্রান্ত এবং রঘুরাম সর্ব্বপ্রধান রাজা হইয়াছিলেন।

"ছেলে হইল না;—ছেলে হইল না" করিয়া রঘুরামের শেষ বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য;—সন্তান ছিল না, এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে লক্ষণাক্রান্ত পুত্র লাভ করিয়া, রাজা যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। প্রথম পুত্র হইলে সম্পন্ন ব্যক্তিরা যেমন ধুম ধাম করিয়া থাকেন, রাজা রঘুরাম তাহা করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মে প্রজাগণের অতিশয় আনন্দ ও উপকার হইয়াছিল। রাজকুমার শিক্ষা-যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত রঘুরাম নানাশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার কিছুরই অপ্রতুল ছিল না; সুতরাং সন্তানকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য যতদূর যত্ন করিতে হয়, সমুদায়ই করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার প্রভাবে অল্প দিনের মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। রাজকুমারদিগের যে সকল নীতিশিক্ষা আবশ্যক, তাহা উত্তমরূপে শিখিলেন। অস্ত্রবিদ্যাও অল্প শিখেন নাই; শুনিতে পাওয়া যায়, মৃগয়াকালে প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্যাঘ্রাদির ভ্রূর মধ্যস্থলে শর বিদ্ধ করিতে পারিতেন। মেরজা মুজঃফার হুসেন নামক একজন মুসল-

মান, তাঁহাকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দেন। মুজঃফার হুসেন ধনুর্ব্বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। তিনি নবাব মুরশিদ্ কুলী খাঁর ভাগিনেয়; কোন কারণে রাগ করিয়া মুরশিদাবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় আগমন করেন। রাজা, মাসিক এক হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া পরম সাদরে তাঁহাকে নিকটে রাখেন। তিনি সভায় আসিলে সভ্যগণ গাত্রোত্থান করিতেন; রাজা স্বয়ং সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন। শরচালনায় তাঁহার এমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তৎকালীন লোকেরা পৌরাণিক দ্রোণভীষ্মাদির সহিত তাঁহার তুলনা করিত। কৃষ্ণচন্দ্র অশ্বারোহণ ও অশ্বচর্চ্চা বিষয়েও বিলক্ষণ পটু হইয়াছিলেন। তিনি লেখা পড়া শিখিয়া যেমন সৎ ও বিনীত হইয়াছিলেন, রাজার ঘরে তেমন প্রায়ই অতি অল্প হয়।

ক্রমে পুত্রকে প্রাপ্ত-বয়স্ক দেখিয়া রঘুরাম রায় তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহে যে, কত সমৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। অনন্তর তাঁহার হস্তে রাজ্য দিয়া রঘুরাম শেষাবস্থায় আপন বংশের রীত্যনুসারে বিষয়-বিরত হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বেই কৃষ্ণচন্দ্রের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভদ্রতা সকলে জানিয়াছিল, এখন তিনি রাজা হওয়াতে প্রজাগণ পরম সুখী হইল।

রাজবাটীতে এরূপ প্রবাদ আছে যে, রঘুরাম, ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃষ্ণচন্দ্রকে রাজসিংহাসন অর্পণ করেন নাই, তাঁহাকে অনেক কষ্টে ও কৌশলে তাহা লাভ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কি কারণে তাদৃশ সুযোগ্য পুত্রকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে ছিলেন তাহার প্রকাশ নাই।

যুবরাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুরুতর শ্রম ও উৎসাহের সহিত দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করিতে লাগিলেন। আত্মসুখে মোহিত না হইয়া কি রূপে প্রজাগণ সুখী হইবে, কেবল তাহারই চেষ্টা করিতেন। কি ছোট কি বড়, সকলের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। তিনি বিচারকালে মান, সম্ভ্রম, পদ, বংশ বা ধনের গৌরব করিতেন না। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা যদি আপাততঃ প্রজাগণের ক্লেশকর হইত, সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেন। তিনি বড় ছিলেন বলিয়া কাহারও ভয়ের পাত্র ছিলেন না, বরং সকলেরই আনন্দ ও আশ্বাসের স্থল ছিলেন। সংক্ষেপতঃ ন্যায়-পথে দাঁড়াইয়া রাজ্য পালন করাই, কৃষ্ণচন্দ্র আপন প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিতেন। অধিক কি, প্রজাগণ তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া আপনাদিগকে রামরাজ্যের প্রজা বলিয়া মনে মনে অভিমান করিত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্বান্ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। এজন্য

তাঁহার রাজসভায় সর্ব্বদা বড় বড় পণ্ডিতের সমাগম হইত। ১১৫৯ সালে বঙ্গকবি ভারতচন্দ্রকে ফরাস্‌ডেঙ্গা হইতে আনিয়া সভাসদ্‌ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর কয় জন সভাসদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন এবং প্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃতজ্ঞ কবি, শরণ তর্কালঙ্কার ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ, এবং অনুকূল বাচস্পতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌ ছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও কয়েক জন বঙ্গভাষার কবি ও উপস্থিতবক্তা * নিয়তই তাঁহার সভায় থাকিতেন। জ্ঞানহীন তোষামোদী লোকেরা তাঁহার নিকটে যাইতে পারিত না। সজ্জনের সহবাসে ও বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগে অবকাশ কাল অতিবাহিত করিতেন। অনেকে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের † (সভার) সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের সভার তুলনা করেন।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন ক্ষত্রিয় রাজগণ যেমন অমিত অর্থ ব্যয় করিয়া বিবিধ যজ্ঞ করিতেন, কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহা-

---

* মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপালভাঁড়, হাস্যার্ণব ইত্যাদি।

† নয় জন বিখ্যাত পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্‌ ছিলেন। এই জন্য তাঁহার সভাকে নবরত্নের সভা বলে। পণ্ডিতগণের নাম ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ, মিহির এবং বররুচি।

দিগের অনুগামী হইতে যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি এক দিন মন্ত্রীকে কোন রূপ যজ্ঞের আয়োজন করিতে কহিলেন। মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডাকাইয়া প্রথমে অগ্নি-হোত্র, পরে বাজপেয় এই উভয়বিধ যজ্ঞের ব্যবস্থা লইয়া তাহার আয়োজন করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যথাক্রমে এই দুই যজ্ঞ সম্পন্ন করায়, স্বদেশীয়দিগের নিকটে "অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র" এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে কত ব্যয় হইয়াছিল, এবং কত দেশের কত লোক আসিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা ভার। ইহা প্রকৃত সৎকর্ম্ম কি না—এত ব্যয় ও আড়ম্বরে উহা সম্পন্ন করিবার আবশ্যকতা আছে কি না—ঐ টাকায় উহা অপেক্ষা অধিকতর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে কি না, এস্থলে এ তর্কের মীমাংসা করিবার তাদৃশ প্রয়োজন নাই। স্থূল কথা, তাদৃশ আঢ্যতম হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কোন ক্রমেই অসঙ্গত নহে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেমন উচ্চ শ্রেণীর লোক ছিলেন, তেমনই বড় বড় কার্য্যদ্বারা দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। এক দিন তাঁহার কর্ণগোচর হইল যে, নসেরেত খাঁ নামক এক জন ভয়ঙ্কর দস্যু তাঁহার রাজ্য মধ্যে বড় উৎপাত করিতেছে। চূর্ণী নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী এক দুর্গম অরণ্যে সে বাস করিত। রাজা তাহার

সন্ধান পাইয়া উপযুক্ত সজ্জায় তাহার শাসনার্থ গমন করেন। যথাস্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, দস্যু পূর্ব্বেই তাঁহার চেষ্টা জানিতে পারিয়া বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছে; সে রাত্রী তাঁহাকে তথায় বাস করিতে হয়। নদীতীরবর্ত্তী শিবিরের সম্মুখে বসিয়া পরদিন প্রাতে মুখপ্রক্ষালন করিতেছিলেন। হঠাৎ জল হইতে একটী বৃহৎ রোহিত মৎস্য লাফাইয়া স্থল ভাগে উত্থিত হইল। রাজার আদেশে ভৃত্যেরা তৎক্ষণাৎ সেই মাছ নিকটে আনিল। আনুলিয়া নিবাসী কৃপারাম রায় নামক জনৈক রাজ-জ্ঞাতি ও সভাসদ্ তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন,—"মহারাজ, এ স্থান অতি উত্তম, রাজভোগ্য সামগ্রী আপনা হইতে আসিয়া আপনার "নজোর" * হইল। অতএব এখানে বাস করিলে সুখী হইবেন।" ঐ স্থান তাঁহারও অতি মনোহর বোধ হওয়াতে † তথায় এক রাজভবন প্রস্তুত এবং তাহার অপর তিন দিকে উক্ত নদীর সহিত সংলগ্ন করিয়া অতি প্রশস্ত পরিখা খনন করাইয়াছিলেন। উত্তর দিকে নদীর সহিত মিলিত পরিখা, পুরীকে কঙ্কণাকারে বেষ্টিত

* উপহার।

† কেহ কেহ বলেন, ঐ স্থানটী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বোধ হওয়ায়, মহারাষ্ট্রীগণের উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তথায় পুরী নির্ম্মাণ করেন।

করিয়াছিল বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উহার নাম কঙ্কণা এবং তথায় বিস্তর শিবমন্দিরাদি স্থাপন করিয়া ঐ পুরীর নাম শিবনিবাস রাখেন। এক্ষণে যে শিবনিবাসের নাম শুনা যায়, তাহা ঐ স্থান। কৃষ্ণচন্দ্র যাবজ্জীবন ঐ স্থানে বাস করেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্যের কোন লক্ষণ নাই। কেবল কয়েকটী ভগ্নপ্রায় দেব মন্দিরাদি আছে। এখন কৃষ্ণনগরের নিকট, যে যাত্রাপুর গ্রাম আছে, এইরূপে তাহারও সৃষ্টি হয়। ঐ স্থানে রাজা একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া "যাত্রাপুরী" তাহার নাম রাখেন। কোন স্থানে যাইবার পূর্ব্বে যাত্রা করিয়া ঐ স্থানে আসিয়া থাকিতেন। কোন সময়ে এক জন উচ্চ বংশীয় কায়স্থকে দক্ষিণ অঞ্চল হইতে আনিয়া ঐ স্থানে বাস করান। ক্রমে অন্যান্য লোকের বাস হইয়া গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে। শিবনিবাসের নিকটস্থ বর্ত্তমান কৃষ্ণপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, চূর্ণির তীরবর্ত্তী হরধাম ও আনন্দধাম, নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাবাস প্রভৃতি গ্রামও তাঁহার স্থাপিত। মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নানোপলক্ষে হরধামের রাজপুরীতে বাস করিতেন এবং শেষাবস্থায় গঙ্গাবাসী হইবার জন্য গঙ্গাবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

কোন সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরিজন ও ভৃত্যবর্গ লইয়া শিবনিবাসে পরম সুখে বাস করিতেছিলেন। এক দিন মধ্যাহ্নকালে দ্বারবান্ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া

কহিল, মুরশিদাবাদ হইতে এক দূত আশিয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র তৎকালের মুসলমান শাসন-কর্ত্তা সিরাজ উদ্দৌলার নাম মনে পড়াতে কৃষ্ণচন্দ্রের মন ভীত ও শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। যেহেতু ঐ পামর সেই সময়ে দেশ উৎসন্ন করিতে বসিয়াছিল; কখন্ কি করে এই চিন্তায় তিনি সতত শঙ্কিত থাকিতেন। দ্বারীকে কহিলেন "তুমি দূতকে বিশ্রাম করিতে কহিয়া পত্র লইয়া আইস।"

প্রতিহারী পত্র আনিয়া রাজার হস্তে দিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ সভা হইতে উঠিয়া এক নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করত পত্রিকার্থ অবগত হইয়া এককালে হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই পত্রে নবাবকে পদচ্যুত করিবার কথা লেখা ছিল। রাজা সেই দিন নিশীথ সময়ে এক নিভৃত স্থানে মন্ত্রী কালীপ্রসাদ সিংহ ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া পত্র পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাদের পরামর্শ চাহিলেন। পত্রার্থ এইরূপ;—"স্বভাবতঃ উদ্ধত, অবিবেচক ও গর্ব্বিত সিরাজ উদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইয়া যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, বোধ করি, আপনি জানিতে পারিতেছেন, কিন্তু রাজধানীতে বাস জন্য আমরা যাদৃশ উত্যক্ত হইয়াছি, আপনি সেরূপ হন নাই। মহাত্মা মুরশিদ্‌কুলী ও আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে মুরশিদাবাদের যেরূপ সুখ ও সৌভাগ্য

ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। পূর্ব্বে যেখানে আনন্দ, উৎসাহ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিত, এখন সেই স্থান বিপন্ন-গণের হাহাকারে আকুল হইয়াছে। হায়! নরাকার পিশাচ শিরাজ উদ্দৌলার রাজ্যে বাস করিয়া সতীর সতীত্ব, ধনীর ধন, মানীর মান ও গর্ভিণীর গর্ভ, বিপদের কারণ হইয়াছে!! কি দুঃখের বিষয়! মুরশিদাবাদের লোক সকল স্ব স্ব ঘর দ্বার ত্যাগ করিয়া পলাইতে উদ্যত। নবাব কাহারও কোন কথা শুনেন না। যাহা হউক, এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য. আমরা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি, আপনি শীঘ্র আসি-বেন।" মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ, মুরশিদাবাদের প্রধান লোকদিগের * লিখিত ঐ পত্র শ্রবণ করিয়া রাজাকে তথায় যাইতে পরামর্শ দিলেন।

অনন্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উপযুক্ত সময়ে মুরশিদাবাদে গমন করিয়া জগৎ শেঠের ভবনে ষড়যন্ত্রকারিগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং বর্ত্তমান কালে বিদ্যা, ধন ও সভ্যতায় যাঁহারা ভুবনের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছেন, অনেক কথার পর, সেই ইংরাজদিগের হস্তে বঙ্গদেশ

---

* জগৎশেঠ্, রাজা রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, সেনাপতি মিরজাফর, রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ, রাজা কৃষ্ণদাস, খোজা-বাজিদ্, রাজা রামনারায়ণ, রাণীভবানী ইত্যাদি।

রক্ষার ভার সমর্পণ করিতে চক্রান্তকারিদিগকে উপদেশ দিলেন। তাহাতেই সিরাজ উদ্দৌলার পতন ও বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজ্যের সূত্রপাত হইল, অতএব দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান নবাবের নৃশংস হস্ত হইতে তৎকালীন প্রজাগণের নিষ্কৃতি ও বাঙ্গালায় ইংরাজাধিকার এ উভয়ই মহাত্মা কৃষ্ণ-চন্দ্রের বিবেচনার ফল বলিতে হইবে। এ কারণ ইংরা-জেরা তাঁহার অতিশয় সম্মান করিতেন এবং তাঁহাকে সম্রাটের নিকট হইতে 'মহারাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধির ফরমান্ আনাইয়া দেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব সাহেব তাঁহাকে পাঁচটী কামান উপহার দিয়াছিলেন; ঐ সকল কামান কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শুনা যায়, যখন পলাশীর যুদ্ধ হয়, তখন বাকী খাজানার দায়ে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শিব-চন্দ্রের সহিত মুরশিদাবাদে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি ষড়যন্ত্রকারিগণের এক জন, ইহা জানিতে পারিয়া, নবাব তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। হত্যাকারি-গণ যে মুহূর্ত্তে কারাগারে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই পলাশীর যুদ্ধজেতা ইংরাজ সৈন্যগণ গিয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনে। যখন নবাব মীর কাশিমের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়, তখনও দুই পিতা পুত্রে মুঙ্গেরের দুর্গে কারারুদ্ধ ও তাঁহারা ইংরাজ পক্ষীয় লোক বলিয়া নবাব কর্ত্তৃক প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত

হন। সেবার কেবল বুদ্ধি কৌশলে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা শুনা যায়, তম্মধ্যে কয়েকটী মাত্র নিম্নে সঙ্কলিত হইল। একদা তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার নিমিত্ত, কোন নিপুণ শিল্পী ঝটিকা-কালীন-প্রকৃতির চিত্রপট সম্মুখে উপস্থিত করে। রাজা ঐ চিত্র, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া পারিতোষিকের জন্য এক টাকা এবং পাথেয় ব্যয়ের জন্য এক শত টাকা চিত্রকরকে দিতে কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন। সভাসদ্গণ এই অসঙ্গত কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—যে ব্যক্তি উড্ডীয়মান বংশপত্রকে নিম্নাভিমুখ করিয়া চিত্র করে, এক টাকাই তাদৃশ বিষয়জ্ঞানবিহীন চিত্রকরের সমুচিত পারিতোষিক; তবে চিত্রখানিতে অধিক পরিশ্রম করিয়াছে বলিয়া পথখরচ কিছু দেওয়া গেল। চিত্রকর মনে করিয়াছিল, রাজা তাহার চিত্রস্থিত তাদৃশ কৌশল ধরিতে পারিবেন না, সুতরাং তাঁহাকে অপ্রতিভ করা সহজ হইবে। এক্ষণে তাহার বিপরীত দেখিয়া রাজার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

কোন সময়ে, তাঁহার একজন সভাসদ্ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যান। রাজা তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন,

"কোথাও কিছু নূতন সামগ্রী দেখিলে আমার জন্য আনিবে।" সভাসদ্ প্রত্যাগমন কালে রাজার জন্য কোন কিছু নূতন দ্রব্য না পাইয়া একটু বিষণ্ণ হইলেন। এক জন চিত্রকর তথায় দুর্গা প্রতিমা চিত্র করিতেছিল। সে সভাসদের বিমর্ষতা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সভাসদ্ বিষণ্ণতার হেতু নির্দ্দেশ করিলে, চিত্রকর আপনার অঙ্গস্থিত নূতন উত্তরীয় বস্ত্রে যথেচ্ছাক্রমে একটী কালির দাগ দিয়া কহিল,—"এই নূতন লও, রাজাকে দিও।" সভাসদ্ তাহাকে বাতুল মনে করিয়া তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন। চিত্রকর জিদ্ করিতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য লোকেও অনুরোধ করিতে লাগিল। সুতরাং সভাসদ্ তাহা লইয়া গিয়া, সমস্ত বিবরণ বলিয়া রাজাকে সঙ্কুচিত ভাবেই উপহার দিলেন। রাজা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং চিত্রকরকে আনাইয়া পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক দেন। পরে সকলকে সেই চিত্রকরের নৈপুণ্য দেখাইয়া দিলেন। সে যথেচ্ছাক্রমে দাগ দিয়াছিল, কিন্তু বস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দাগটী, পাশাপাশি দুইটী সূতা অতিক্রম করে নাই। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজস্ব নিমিত্ত দশ লক্ষ টাকা পৈতৃক ঋণ ছিল এবং ঐ নবাব তাঁহার নিকটও দ্বাদশ লক্ষ টাকা নজরানা চাহিয়াছিলেন। [illegible] অর্থ

পরিশোধ করিতে না পারায় আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল সদ্‌গুণ ও বুদ্ধি কৌশল প্রদর্শন দ্বারা ঐ ভয়ানক দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আলিবর্দ্দির পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

১১৮৯ সালে (১৭৮৩খৃঃ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনি অতি উত্তম লোক ছিলেন। দুঃখীর দুঃখ দেখিতে পারিতেন না, যেরূপেই হউক তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ব্যয় ছিল। পথ, ঘাট, পান্থনিবাস, সরোবর প্রভৃতি সাধারণের হিত-জনক বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অর্থব্যয় দ্বারা বিদ্যাব্যবসায়িদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন। অধ্যাপ-নার্থ অনেক অধ্যাপককে টোল ও বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিতেন এবং পণ্ডিতগণের সহিত সর্ব্বদা শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার সভা, পণ্ডিত-গণের আরামস্থল ছিল। তিনিই বঙ্গকবি ভারতচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ খ্যাতির সূত্রপাত করিয়া দেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যৎপরোনাস্তি ভক্তি ও বিশ্বাস থাকাতে সর্ব্বদাই শাস্ত্রানুসারে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। ধর্ম্মানুরাগের আতিশয্য হইলে, অনুষ্ঠানে প্রায়ই গোল-যোগ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ রাজার, ধর্ম্মবিশেষে পক্ষ-

পাত, অধিক অনিষ্টের কারণ হয়। নিম্নলিখিত আখ্যা-
য়িকার দ্বারা তাহার কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে।
কোন সময়ে নদীয়া রাজ্যে মারী উপস্থিত হওয়াতে
রাজা আদেশ প্রচার করিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে
শ্যামাপূজার রজনীতে লক্ষ পূজা হইবে। আদেশ
প্রতিপালিত হইল। পর দিন অবগত হইলেন যে,
এক জন গোপব্রাহ্মণ ঐ রজনীতে সাত খান পূজা করি-
য়াছিল। রাজা ধনপ্রাণের ন্যায় ধর্মরক্ষারও কর্ত্তা,
সুতরাং ঐ ব্রাহ্মণের দণ্ডবিধানে উদ্যত হইলেন।
ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, গোয়ালামহলে এত অধিক পূজা
হইয়াছে যে, তাহার উপযুক্ত সংখ্যক পুরোহিত পাওয়া
দুর্ঘট। ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, ঐ ধর্মকার্য্যটী
যথাবিহিত রূপে অনুষ্ঠিত হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্রে
আর একটী কলঙ্কের কথা শুনা যায়। ঢাকার গবর্ণর
রাজা রাজবল্লভ স্বকীয় বালবিধবা কন্যার পুনঃসংস্কা-
রার্থ নদীয়া সমাজের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ব্যবস্থা
সংগ্রহ নিমিত্ত কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ করেন। রাজা
কৃষ্ণচন্দ্র সেই সূত্রে বিলক্ষণ চাতুর্য্য ও নীচতা প্রকাশ
করিয়াছিলেন।

অনেকে কহেন, তাঁহার চরিত্রের কোন কোন অংশে
দোষ ছিল; তিনি অন্যান্য পুত্রদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া
জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র রায়কেই সমস্ত রাজ্যের অধিকারী

করিয়াছিলেন। এরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায়। কারণ, অন্য স্থলে যাহাই হউক, রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হইবে, এপ্রথা এদেশে চিরকাল হইতে প্রচলিত। সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। অধিকন্তু যাঁহারা জ্যেষ্ঠাধিকারের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই কার্য্যের উল্লেখ করিয়াই তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ই, এদেশে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রচলিত করিবার প্রথম পথ-প্রদর্শক। ফলে যিনি যাহাই বলুন, তাঁহার বংশের পরিণাম দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা এদেশের উপযোগী নহে। অন্ততঃ তাঁহার সময়ে ঐ প্রথার উপযোগিতা এদেশে উপস্থিত হয় নাই।

এই স্থলে তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণের বিষয় কিছু বলা অসঙ্গত হইবে না। রাজার দুই রাণী ছিলেন। বড় রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র, ও ঈশানচন্দ্র পাঁচ পুত্র এবং ছোট রাণীর গর্ভে কেবল শম্ভুচন্দ্র, এই ছয় পুত্র হয়। ছোট রাণীর বিবাহ সম্বন্ধে একটী মনোরম আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ আছে। রাণাঘাটের এক মাইল উত্তরপূর্ব্ব নোকাড়ি (নৌকাড়ি-নৌকার আড্ডা) বলিয়া এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। উহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া "বাচ্‌কোর খাল" বলিয়া চুর্ণী নদীর একটী ক্ষুদ্র খাল গিয়াছে। পূর্ব্ব কালে ঐ খালটী

একটী প্রবল নদী ছিল। গ্রামের নামের দ্বারাও তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোন সময়ে ঐ নদী দিয়া নৌকাযোগে গমন করিতে ছিলেন। বোধহয়, তিনি ঐ নদী দিয়া তাঁহার শ্রীনগরস্থ রাজপুরীতে যাতায়াত করিতেন। নোকাড়ির ঘাটে একটী পরম সুন্দরী কন্যাকে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়া সেটী,—কে, জানিতে ইচ্ছা করিলেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন সুন্দরী,—অনূঢ়া,—ব্রাহ্মণকন্যা। তাহার পিতাকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার কন্যাকে বিবাহ করিব।" কন্যার পিতা কহিলেন, "আপনি আমার কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী করিবেন, ইহা আমার বড়ই সৌভাগ্য; কিন্তু কিশোরকুনিকে কন্যা দান করিলে আমাকে একটু ছোট হইতে হইবে।" যাহা হউক, ব্রাহ্মণের সে আপত্তি রহিল না, রাজা সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে নবপ্রণয়িনীকে রজত পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইয়া কহিলেন, "দেখ! আমাকে বিবাহ করিয়া রূপার খাটে শয়ন করিতে পাইলে।" পত্নী উত্তর করিলেন, "আরও একটু উচ্চরে*

* ইহার তাৎপর্য্য এই,—"তোমাকে বিবাহ করিয়া ছোট হইয়া রূপার খাটে শুইয়াছি; মুরশিদাবাদের নবাবকে বিবাহ করিয়া আরও ছোট হইলে, সোণার খাটে শয়ন করিতে পাইতাম।"

যাইলে সোণার খাটে শয়ন করিতে পাইতাম। এতাদৃশ তেজোগর্ভ স্পষ্ট উত্তর শুনিয়া মহারাজ মহিষীর প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি শিবনিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বাস করেন। গঙ্গা হইতে চূর্ণী নদীতে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে ঐ নদীর উভয় পার্শ্বে হর-ধাম ও আনন্দ-ধাম নামক দুইটী স্থান দৃষ্ট হয়; শম্ভুচন্দ্র প্রথমটীতে ও ঈশানচন্দ্র দ্বিতীয়টীতে আসিয়া বাস করিলেন। শিবনিবাসে মহেশচন্দ্র গমন করিলেন এবং ভৈরবচন্দ্র পুত্রহীনতা নিবন্ধন শিবচন্দ্রের কাছে থাকিলেন। শিবচন্দ্র প্রায়ই শিবনিবাসে বাস করিতেন,—মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনগরে আসিতেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কে কিরূপ সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, জানা যায় না। কেবল শম্ভুচন্দ্র নিজ ক্ষমতায় বহুসংখ্যক নগদ টাকা এবং অনেক টাকার ভূসম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে কেহই মন্দ ছিলেন না, প্রায় সকলেই রাজপুত্রের ন্যায় গুণসম্পন্ন ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের লোক ছিলেন। এক্ষণে, শিবচন্দ্রের বংশাবলী ব্যতীত আর সকলের সন্তান সন্ততিগণ অত্যন্ত হীন অবস্থায় আছেন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন *।
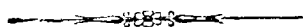
ইনি, প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী গ্রামে ১১০২ সালে (১৬৯৫খৃঃ) ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রুদ্র-দেব তর্কবাগীশ। যখন জগন্নাথের জন্ম হয় তখন তাঁহার বয়ক্রম ছয়াট্টি বৎসর হইয়াছিল। রুদ্র-দেব সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ঐ শাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, ঐ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

* রঘুনাথ তর্কবাচস্পতি, নিবাস কামালপুর, ত্রিবে-ণীতে তাঁহার টোল ছিল। টোলের নিকটে এক সামান্য কুটীরে ভগবতী নাম্নী একটী বিধবা ব্রাহ্মণী, স্বীয় পঞ্চম বর্ষীয় শিশু লইয়া বাস করিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে "ভগী" বলিয়া ডাকিতেন। ভগী টোলের অনেক কাজ করিত। এক দিন ক্ষার সিদ্ধ করিবার জন্য শিশুকে টোলে আগুণ আনিতে পাঠাইল। তর্কবাচস্পতি এক হাতা আগুণ লইয়া "ধর্-ধর্, হাত পেতে আগুণ নে" বলিলেন। শিশু কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া এক অঞ্জলি ধূলা লইয়া আগুণ লইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ভট্টাচার্য্য বালকের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া,—"ভগী,—ভগী,—" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। ভগী আইলে বলিলেন,—"তোর এই ছেলেটী আমায় দে।" ভগী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। ভট্টাচার্য্য শুভ দিনে বালকের বিদ্যারম্ভ করিয়া দিলেন। যাবতীয়

তাঁহার কিছুমাত্র সঙ্গতি ছিল না; কর্ম্মকাণ্ডের নিমন্ত্রণ ও শিষ্য যজমানের দ্বারা যাহা কিছু লাভ হইত তাহাতেই কোন রূপে বহু পরিবারের ভরণ পোষণ করিতেন। তিনি অনপত্যতা ও দরিদ্রতা নিবন্ধন বহু দিন যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়া শেষ অবস্থায়, দগ্ধ তরুর ফলের ন্যায় এক পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন।

ক্রমে পুত্রের নামকরণের সময় উপস্থিত হইলে শ্বশুরের ইচ্ছানুসারে বালকের নাম জগন্নাথ রাখা হইল। এই রূপ একটী প্রবাদ আছে যে, শেষাবস্থায় রুদ্রদেবের এক অলৌকিক গুণসম্পন্ন সন্তান হইবে,—কোন ভবিষ্যদ্বক্তার মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব ব্রহ্মচারী সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে আপন বালিকা কন্যা প্রদান করেন এবং সেই কন্যার পুত্র কামনায় পুরুষোত্তম গমন করিয়া পুরশ্চারণাদি নানা দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। কিছু দিন পরে, এই প্রত্যাদেশ হয় যে,—"তোমার কন্যার গর্ভে এক নররত্নের জন্ম হইবে, তুমি

পাঠ একবারের অধিক বলিতে হইত না। এই বালককে ক খ শিখাইতে গিয়া সমগ্র ব্যাকরণ শিখাইতে হইয়াছিল। ঐ বালকই সুবিখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। অধুনাতন প্রাচীনগণ এইরূপ একটী গল্প করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা জগন্নাথের প্রপৌত্র বামনদাস তর্কবাচস্পতির প্রমুখাৎ তাঁহার বাল্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ইহার কোন্‌টী সত্য, বহুদর্শীগণ তাহার বিচার করিবেন।

গৃহে গমন কর;—শিশুর নাম জগন্নাথ রাখিও।”
এই নিমিত্ত তিনি দৌহিত্রের নাম জগন্নাথ রাখিলেন।

জগন্নাথ বাল্যকালে অতিশয় দুঃশীল ছিলেন। যে বালক শৈশবে অত্যন্ত দুষ্ট হয়, অনেকে তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া থাকেন। ফলতঃ একথা নিতান্ত অসঙ্গত ও বোধ হয় না। বিশেষতঃ জগন্নাথের স্বভাব ইহার পক্ষে স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি বালক কালে যেমন দুষ্ট ছিলেন—বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তেমনই অসামান্য বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করেন। বুদ্ধিমান্ হইলেই যে দুষ্ট হইতে হইবে এমন নয়, বালক অশান্ত ও দুষ্ট হইবার অপর কতকগুলি কারণও আছে। জগন্নাথের পক্ষে সে সমুদায়ই ঘটিয়াছিল। একে বৃদ্ধ বয়সের পুত্র বলিয়া পিতা বিলক্ষণ আদর দিতেন, তাহাতে আবার ৮ বৎসরের সময় জননীর মৃত্যু হওয়াতে জগন্নাথ ‘মাওড়া’ হইয়া পড়িলেন। মাতৃহীন শিশুরা প্রায়ই অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইয়া আদুরে হইয়া পড়ে তাহা কে না জানেন? এইরূপ আদরের সঙ্গে সঙ্গে যে, দুষ্টতা আসিয়া জুটে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তিনি, কটুবাক্য প্রয়োগ ও প্রহার করিতে করিতে পথিকগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেন, ঢেলা মারিয়া নারীদিগের কলসী ভাঙ্গিয়া উচ্চরবে হাস্য ও নৃত্য করিতেন, গাছে উঠিয়া পত্রের অন্তরালে থাকিয়া

নীচের লোকদিগের গাত্রে প্রস্রাব ও মল ত্যাগ করিতেন, এবং সর্ব্বদাই কলহ, বিবাদ, মারামারি ও চুরি করিয়া লোককে বিরক্ত করিতেন। তিনি এরূপ দুষ্ট ছিলেন যে, কোন সময়ে বাঁশবেড়িয়ার পঞ্চানন ঠাকুরের পাণ্ডার কাছে একটী পাঁঠা চাহিয়াছিলেন; পাণ্ডা তাহা না দেওয়াতে, জগন্নাথ রাগ করিয়া ঐ ঠাকুরের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি অপহরণ পূর্ব্বক কোন পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন! দুষ্টতা নিবন্ধন জগন্নাথ বাল্যকালেই এক প্রকার বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সুতরাং নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে চিনিতেন। ঠাকুর চুরি গেলে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা জগন্নাথেরই কর্ম্ম। যাহা হউক, পরে, পাণ্ডারা তাঁহাকে বৎসর বৎসর একটা করিয়া পাঁঠা দিবে স্বীকার করিলে, জলের ভিতর হইতে ঠাকুর উঠাইয়া দেন। অনুক্ষণ এইরূপ ও অপর বিবিধ প্রকার কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। এই সময়ে তাঁহার এক মাতৃস্বসা তাঁহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় রুদ্রদেব তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া, মুখে মুখে ব্যাকরণর ও অভিধান শিখাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ২।৪ খানি সাহিত্যও পড়াইলেন। জগন্নাথ আপনার অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধা প্রভাবে ঐ সকল গ্রন্থ, অতি আশ্চর্য্যরূপে অধ্যয়ন

করিতে লাগিলেন। এক দিন কয়েক জন প্রতিবেশী তাঁহার দৌরাত্ম্যে উত্যক্ত হইয়া রুদ্রদেবের নিকট অভি-যোগ করিলেন। তিনি ইহাতে রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে নিকটে আহ্বান ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—"জগন্নাথ তুমি নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত ও লেখা পড়ায় অনাবিষ্ট ; বোধ হয়, তুমি আমাকে নানাপ্রকারে অসুখী করিবার নিমিত্তই আমার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। ভাল! পুস্তক আন—কি শিখিয়াছ দেখি!" জগন্নাথ সত্বর পুথি আনিয়া কহিলেন ;—"আমি যাহা পড়িয়াছি তাহাই বলিব—না কল্য যাহা পড়িব তাহা বলিব?" ইহা শুনিয়া পিতা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "ভাল! জগন্নাথ! কল্য যাহা পড়িবে তাহা কি বলিতে পার?" জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ পুথি খুলিয়া পূর্ব্ব-পঠিতের ন্যায় অপঠিত পাঠ আবৃত্তি করিলেন। পুত্রের এইরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া পিতার আনন্দের সীমা রহিল না।

জগন্নাথ বাল্যকালে অতিশয় 'আবদারী' ছিলেন। যাহা ধরিতেন কোন রূপেই ছাড়িতেন না। যতক্ষণ অভিলষিত বস্তু না পাইতেন কেবল জননীকে গালি দিতেন, মারিতেন ও নানাপ্রকার উপদ্রব করিতেন। কিন্তু প্রার্থিত বস্তু পাইলেই, সব ভাল হইয়া যাইত, মনে আহ্লাদ ধরিত না।

তিনি পিতার নিকট ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি প্রথম পাঠ্য পুস্তক গুলি সমাপ্ত করিয়া, জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বংশবাটী (বাঁশবেড়িয়া) স্থিত টোলে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিনের মধ্যে এই শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন এই শাস্ত্রে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, যখন এই শাস্ত্রের যথোপযুক্ত বিচার করিতে পারিতেন এবং এই শাস্ত্র বিলোড়ন করিয়া যখন দুরূহ ব্যবস্থা সকল প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র!!

ইহার কিছুকাল পরে ১১১৬ সালে (১৭০৯খৃঃ) রুদ্রদেব মেড়ে গ্রাম নিবাসিনী এক সুলক্ষণা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। তখন জগন্নাথের বয়স চৌদ্দ বৎসর। পিতা-মাতা বৃদ্ধ ও সন্ততিবৎসল হইলে সন্তানগণের প্রায়ই বাল্যে বিবাহ হইয়া থাকে।

যাহা হউক, অতঃপর তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। ন্যায়শাস্ত্র অতীব দুরূহ। বিচারাদি করা দূরে থাকুক, অনেকে উহা বুঝিতেও পারেন না। কিন্তু জগন্নাথ অসাধারণ প্রতিভার প্রভাবে এবং অসামান্য শ্রম ও যত্নবলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এমন কি অধ্যয়ন আরম্ভের এক বৎসর পরেই ন্যায়শাস্ত্রের বিচার দ্বারা নবদ্বীপের

এক জন বিখ্যাত প্রাচীন পণ্ডিতকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তটী মনোরম বোধে নিম্নে বিশেষরূপে লিখিত হইল।

কামালপুর নিবাসী রঘুদেব বাচস্পতি নামক এক জন নৈয়ায়িক ত্রিবেণীতে টোল করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। জগন্নাথও ঐ টোলে পড়িতেন। এক দিন রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ নামক এক জন পণ্ডিত, রঘুদেবের টোলে আসিয়া অতিথি হইলেন। যিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরতিশয় পরিশ্রম ও চেষ্টা দ্বারা নানা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যিনি সুকঠিন ন্যায়শাস্ত্রের টীকা করিয়া বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, রমাবল্লভ সেই মহামহোপাধ্যায় জগদীশ তর্কালঙ্কারের পৌত্র। ইনি রঘুদেবের টোলে পদার্পণ করিয়াই মহাদর্পে বিচার আরম্ভ করিলেন; বিবিধ তর্কদ্বারা অধ্যাপকের সহিত সমস্ত ছাত্রকে পরাজিত করিলেন। অবশেষে টোলের সকলেই বিচারে পরাস্ত হইল বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। জগন্নাথ ইহার কিছুই জানেন না, তিনি তখন বাড়ীতে আহার করিতে গিয়াছিলেন। টোলে আসিয়া শুনিলেন, রমাবল্লভ আতিথ্য গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তখনই তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে ত্রিবেণী ও বাঁশবেড়িয়ার মধ্যস্থলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

যে সাক্ষাৎ, সেই শাস্ত্রীয় কথারম্ভ! এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এই একটী বিশেষ গুণ, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তাঁহারা বিচারে এলেন না। সুতরাং রমা-বল্লভ কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইয়া পুনরায় ত্রিবেণীর দিকে আসিতে লাগিলেন। তিনি জগন্নাথের কথার বাঁধুনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। এইরূপে, জগন্নাথ তাঁহাকে টোলে আনিয়া আহারাদি করাইয়া পরম সমাদরে বিদায় করিলেন।

জগন্নাথ বুদ্ধিনৈপুণ্য ও অভিনিবেশ সহকারে আরও সাত আট বৎসর, ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রানু-শীলনে নিযুক্ত থাকিয়া এককালে নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। লেখা পড়ার কথায় এত আমোদ ছিল যে, শাস্ত্র ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। একবার যাঁহার সহিত বিচার হইত, তিনিই জগন্নাথকে বিশেষরূপে চিনিয়া যাইতেন। ক্রমশঃ, দেশ বিদেশের সকলেই জানিতে পারিলেন যে, জগন্নাথ এক জন প্রকৃত পণ্ডিত। এই সময়ে তাঁহার প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বাল্যকালে যেমন বিজাতীয় দুষ্ট ও দুরাচার ছিলেন, এক্ষণে তেমনই শান্ত ও সদাচারী হইলেন। এইটী যে বিদ্যানুশীলনের ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চব্বিশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। রুদ্রদেবের কিছুই সংস্থান ছিল না, সংসারের ভার মাথায় পড়িল দেখিয়া জগন্নাথ ভাবিয়া আকুল হইলেন। অবস্থা এত মন্দ ছিল, পরে কি হইবে তাহা ভাবা দূরে থাকুক, কিরূপে গলার কাচা ফেলিয়া শুদ্ধ হইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পিতৃ শ্রাদ্ধ একরূপ নির্ব্বাহিত করিলেন; কিন্তু আজ খান এমন সঙ্গতি রহিল না।

কিছু কিছু না আনিলে আর কোন রূপেই চলে না, সুতরাং জগন্নাথকে টোলের পড়া ছাড়িয়া, উপার্জ্জনের পথ দেখিতে হইল। এই সময়েই অধ্যাপক তাঁহাকে "তর্কপঞ্চানন" উপাধি দিলেন। কোন ক্রমে এক খানি টোল বাঁধিয়া কয়েকটী ছাত্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উত্তরোত্তর বিলক্ষণ নাম সম্ভ্রম হইয়া উঠিল, নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণের পত্র আসিতে লাগিল। যিনি কিছু দিন পূর্ব্বে পরের কাছে জলপাত্র চাহিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে ঘড়া গাড়ু প্রভৃতি জল-পাত্র তাঁহার ঘরে ধরে না! এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল।

এই সময় হইতে তর্কপঞ্চাননের ক্রমে ক্রমে তিনটী পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠের নাম কালিদাস, মধ্যমের নাম কৃষ্ণ-চন্দ্র এবং কনিষ্ঠের নাম রামনিধি। মধ্যম ও কনিষ্ঠের

অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। ঐ সকল সন্তানের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম অতি আশ্চর্য্য লোক ছিলেন। এখানে তাঁহার বিষয় কিছু না লিখিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না।

তিনি ন্যায় ও ব্যবস্থাশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। এখনকার লোকদিগের যেমন চাকরীই বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং চাকরীর জন্য মান, অপমান, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুতেই দৃষ্টি থাকে না, সার্ব্বভৌমের সমকালে সেরূপ ছিল না, তাঁহারই চরিত্রঘটিত একটী বিষয় তাহার পরিচয় দিতেছে; অথবা তিনিই অসামান্য চরিত্র ছিলেন। একদা সদর দেওয়ানীর জজ্ মহামান্য কোলব্রুক্ সাহেব ঘনশ্যামকে সেই আদালতের প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিরোহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া দূরে থাকুক, ইহা শুনিবামাত্র তিনি যার পর নাই চিন্তাকুল ও বিষণ্ণ হইলেন। চাকরী স্বীকার করিলে জীবন অপবিত্র ও শাস্ত্র অধ্যয়ন নিষ্ফল হইবে, মনে মনে তাঁহার এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল। কতই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিশেষে, পরিজন ও বান্ধবগণের অনুরোধে তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

মহাত্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কি শুভক্ষণেই পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলা যায় না। তিনি

অসাধারণ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার গৌরবের সীমা ছিল না। তাঁহার যদি কিয়ৎ পরিমাণেও ধনী হইবার অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে আপনার বিদ্যা ও সম্মানের অনুরূপ ধনশালী হইতে পারিতেন; যেহেতু যত্ন ছিল না তথাপি তাঁহার এত আয় হইত যে, তাঁহাকে ধনী বলিয়া পরিচিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে পিতলের "অমৃতী" জলপাত্র, অনধিক ১০/০ বিঘা নিষ্কর ভূমি, ও তৃণাচ্ছাদিত নিতান্ত ভগ্ন একখানি ঘর ছিল। কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে অন্যূন এক লক্ষ টাকা নগদ এবং বার্ষিক চারি হাজার টাকা উপস্বত্বের নিষ্কর ভূমি রাখিয়া যান। ঐ ভূমির অধিকাংশ, বর্দ্ধমানাধিপতি ত্রিলোকচন্দ্র বাহাদুরের প্রদত্ত।

অনেকে বলিয়া থাকেন, তর্কপঞ্চাননের অর্থ লালসা কিছু বলবতী ছিল। অনেকে তাহার প্রমাণার্থ বলেন যে, তিনি অসংখ্য মন্ত্র-শিষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক গুলি মন্ত্র-শিষ্য ছিল একথা সত্য; কিন্তু ইহা তাঁহার অর্থলালসার প্রমাণ নহে; তাহার অন্য কারণ আছে। তাঁহার সহিত অনেক বড় বড় লোকের বাধ্যবাধকতা ছিল। তাঁহার অনুরোধে ঐ সকল লোকের দ্বারা কোন প্রকারে জীবিকা সংস্থান করিয়া লইবার জন্য, অনেক কর্ম্মহীন ব্যক্তি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল।

বরং তিনি যে অর্থলিপ্সু ছিলেন না, এই গ্রন্থের স্থানান্তরে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তখনকার প্রধান শাসনকর্ত্তা সর্ জন্ শোর্ ও বিচারপতি সর্ উইলিয়ম্ জোন্স্ প্রভৃতি বড় বড় লোকের অনুরোধে দুরূহ সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অনেক ব্যবস্থা অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। "অষ্টাদশ বিবাদের বিচার গ্রন্থ" এবং "বিবাদভঙ্গার্ণব" নামক দায়-সংক্রান্ত দুই বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন। এই সকল গ্রন্থের রচনাকালে তিনি কোম্পানি হইতে মাসিক ৫০০ ৲ টাকা এবং ঐ সকলের রচনাকার্য্য শেষ হইলে মাসিক ৩০০ ৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। উহা ব্যতীত রামচরিতবর্ণনাদি দুই এক খানি নাটক এবং ন্যায় শাস্ত্রের কয়েক খানি সংগ্রহ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অধ্যাপনাকার্য্যেই তাঁহার অধিক সময় ব্যয়িত হইত, নতুবা অবকাশ পাইলে স্বকীয় ক্ষমতানুরূপ আরও অনেক গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন। কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ে অনেক মোকর্দ্দমা তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে নিষ্পন্ন হইত। মুরসিদাবাদের নবাব তাঁহাকে একটী শীল মোহর প্রদান করিয়াছিলেন। উহাতে "সুধীবর কবি বিপ্রেন্দ্র শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য" এই কয়টী অক্ষর অঙ্কিত ছিল। তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা পত্র সকলে এই মোহরের সহী দিতেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও অধ্যাপনার রীতি সর্ব্বত্র

প্রচারিত হইলে টোল বিলক্ষণ জাঁকিয়া উঠিল। বিদ্যার্থিগণ নানা দেশ হইতে আসিতে লাগিল। ছাত্র-সংখ্যা প্রায় এক শত হইয়া উঠিল। তিনি প্রত্যহ এই বহু ছাত্রের আহার প্রদান করিতেন। তাঁহার অধ্যাপনার গুণে ছাত্রেরাও এক এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ঐ সকলের মধ্যে কাহার কাহার সন্তানেরা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া স্থানে স্থানে বিদ্যা-লোচনা করিতেছেন। জগন্নাথ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর ২। ১ মাস পূর্ব্বে উহা হইতে নিবৃত্ত হন।

তাঁহার গৌরবের কথা কি কহিব! কি দরিদ্র, কি ধনবান্, কি মূর্খ, কি বিদ্বান্, সকলেই তাঁহাকে আদর করিত এবং দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। নানা প্রকার শাস্ত্রীয় কথা, কাব্য-ইতিহাসের মনোরম উপাখ্যান এবং অন্যান্য রহস্য-জনক বিষয় শ্রবণ মানসে লোকে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গমনাগমন করিত। তাঁহার উপস্থিত-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাঁহাকে যে কোন বিষয় হউক, জিজ্ঞাসা করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রকৃত বা রহস্য-জনক তৃপ্তিকর উত্তর দিতে পারিতেন,—কোন প্রশ্নেই ঠেকিতেন না। এই জন্য বিষয়ী লোকেরা কৌতুকাবহ উত্তর পাইবার আশয়ে তাঁহার নিকট নানা অদ্ভুত বিষয়ের প্রশ্ন করিত, তিনিও

তাহাদিগের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করিতেন, এবং স্বয়ংও আনন্দিত হইতেন।

যিনি ইংরাজদিগের অভ্যুদয় কালে ষাটি টাকা বেতনের মুন্‌সিগিরী হইতে ক্রমশঃ রাজা হইয়া ছিলেন, সেই রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সহিত তর্কপঞ্চাননের বিশেষ প্রণয় ছিল। কলিকাতার শোভাবাজারে ইহাঁর বাড়ী। ইনি, তর্কপঞ্চাননকে অতিশয় সম্মান করিতেন, সর্ব্বদা তাঁহার বাটীতে যাইতেন, এবং নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। জগন্নাথকে ইনিই প্রথমে কোটা করিয়া দেন, এবং তাঁহার সাহায্যেই তিনি চণ্ডীমণ্ডপ বাঁধিয়া দুর্গোৎসব করিতে আরম্ভ করেন।

যে দেওয়ান নন্দকুমার রায়, নবাব সরকারে বড় বড় চাকরী করিয়া অতিশয় সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, যিনি তৎকালে এক জন প্রধান বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য হইতেন, তিনিও তর্কপঞ্চাননকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিতেন। অবকাশ পাইলেই ত্রিবেণীতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন।

তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হারিংটন্‌ সাহেব অবসর পাইলেই তর্কপঞ্চাননের ভবনে আগমন করিতেন, এবং ব্যবস্থাসংক্রান্ত কোন বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকিলে তাহার মীমাংসা

করিয়া লইয়া যাইতেন। হারিংটনের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

অসাধারণ বুদ্ধি-বিদ্যা-সম্পন্ন জগদ্বিখ্যাত সর উইলিয়ম জোন্স* এই সময়ে এদেশে বিচার কর্ম্ম করিতেন। তিনি জগন্নাথের বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া অবসর মতে সস্ত্রীক হইয়া ত্রিবেণীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এক দিন দেখা করিতে আসিয়াছেন, এমন সময়ে এক জন তাঁহাকে পূজার দালানে উঠিয়া বসিতে কহিলে তাঁহার সুশিক্ষিতা স্ত্রী "আবাং ম্লেচ্ছৌ" ইত্যাদি সংস্কৃত কথাদ্বারা পূজার দালানে বসিবার প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ করিলেন। পরে বাটীর মধ্যে গমন করিয়া বিবিধ সদালাপে পুরবাসিনী ও প্রতিবেশিনী কামিনীগণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

নদীয়ার জজ্ সাহেব আপনার বাঙ্গালাধ্যাপক রামলোচন কবিরাজের মুখে জগন্নাথের কথা শুনিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। রামলোচন ত্রিবেণী আসিয়া আগ্রহের সহিত সাহেবের অভিলাষ প্রকাশ করিলে তর্কপঞ্চানন কৃষ্ণনগর গমন করিলেন। জজ সাহেব যেমন শুনিয়াছিলেন, আলাপে পরিচয়দ্বারা তদনুরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া পরম পরিতুষ্ট

* ইনি ১৭৪৫ খৃঃ অব্দের ২০ এ সেপ্টেম্বর লণ্ডন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন।

হইলেন এবং স্বাভিপ্রেত কতিপয় ব্যবস্থার অনুবাদে অনুরোধ করিলেন। তর্কপঞ্চানন তাঁহার উপকারের জন্য কিছু দিন তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

এই সময়ে দেশে ডাকাইতির ভয় হইয়াছিল। ভীরু-স্বভাব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত জগন্নাথ সেই জন্য সততই শঙ্কিত থাকিতেন; দশ টাকা সংস্থান থাকাই তাঁহার সেই আশ-ঙ্কার বিশেষ কারণ হইয়াছিল। প্রধান বিচারপতি সর্ উইলিয়ম্ জোন্স তর্কপঞ্চাননকে বিশিষ্টরূপ সম্মান করিতেন এবং আন্তরিক ভাল বাসিতেন; তিনি ঐ ব্যাপার অবগত হইয়া নিজে বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার ধনসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কয়েক জন বন্দুকধারী সিপাহী প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; তাহারা তাঁহার বাড়ীতে দিবারাত্র পাহারা দিত।

বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়, তর্কপঞ্চাননের প্রতি বিলক্ষণ সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অনেক নিষ্কর ভূমি এবং নিজ ত্রিবেণীতেই একটী বৃহৎ পুষ্ক-রিণী দান করেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, রাজা নবকৃষ্ণ, তর্ক-পঞ্চাননের নিতান্ত হিতাভিলাষী ছিলেন। এক্ষণে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক, তাঁহাকে একখানি অনেক টাকা মুনফার তালুক দিতে চাহিলেন। কিন্তু তর্কপঞ্চানন, বিষয়

অনেক অনর্থের মূল—ধনী হইলে তাঁহার বংশীয়েরা বাবু হইয়া উঠিবে—ক্রমে বংশমধ্যে বিদ্যার আলোচনা কমিয়া আসিবে, এই ভাবিয়া তালুক গ্রহণে অসম্মত হইলেন। অবশেষে, রাজা অনেক যত্নে, জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের ভার আপন হাতে রাখিয়া, ত্রিবেণীর নিকটে 'হেদে পোতা' নামে এক খানি সামান্য লাভের তালুক গতাইলেন।

নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহাকে অধ্যাপনা কার্য্যে উৎসাহী করিবার জন্য উখুড়া পরগণায় সাত শত বিঘা জমী দান করেন। সেই জমীর উপস্বত্ব হইতে তাঁহার বংশাবলী অদ্যাপি সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

তর্কপঞ্চাননের ব্যবস্থাবলে পুঁটিয়ার রাজা একটী মোকর্দ্দমা জিতিয়া ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। তর্কপঞ্চানন বাল্যকাল হইতে মন দিয়া ও পরিশ্রম করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার শেষাবস্থায় ঈদৃশ সম্মানের সহিত চারিদিক হইতে লাভ হইতে লাগিল। হে বালকগণ! তোমরাও মন দিয়া লেখা পড়া কর—এক এক জন, এক এক জগন্নাথ হইতে পারিবে।

যেমন তাঁহার লাভ বাড়িতে লাগিল, তেমনই তিনি সদ্ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্গোৎসব, শ্যামা পূজা প্রভৃতি

ক্রিয়া কাণ্ড যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া তদুপলক্ষে অন্ন ও অর্থ বিতরণ করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অতিথি-সেবাও ছিল; যে যখন উপস্থিত হইত, সাধ্যানুসারে তাহার আহার প্রদান করিতেন। কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার আতিথ্য, স্বল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইত। কোন সময়ে এক জন অতিথি তাঁহার গৃহে দগ্ধ বার্ত্তাকু চুল্লী হইতে তুলিতে না পারিয়া, দেওয়ালের গায় নিম্ন লিখিত শ্লোকটী লিখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন;—

'কীটাকুলতবার্ত্তাকুরেকাখুবৃষণোপমা।
পঞ্চাননাদ্বিনিষ্ক্রান্তো ন নিষ্ক্রান্তো হুতাশনাৎ॥'

ইন্দুরের বৃষণ সদৃশ পোকাধরা একটী বার্ত্তাকু যদিও না তর্কপঞ্চানন হইতে বাহির হইল, কিন্তু অগ্নি হইতে বাহির হইল না।

তাঁহার বুদ্ধি ও মেধা যে, কত প্রবল ছিল বলা যায় না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি বিষয়ে একটী আশ্চর্য্য গল্প প্রসিদ্ধ আছে; এখানে সেটী না বলিয়া থাকা গেল না। এক দিন ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেখানে এক খানা বজরা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ বজরা হইতে দুই জন সামান্য ইংরাজ ডাঙ্গায় নামিয়া পরস্পর ঝগড়া বাধাইয়া দিল। দুই জনে বিলক্ষণ রোকারোকি ও ঘুঁসাঘুঁসি হইয়া

গেল। তর্কপঞ্চানন আহ্নিক করিতে করিতে তাহাদের ঝগড়া আগাগোড়া শুনিলেন।

সাহেবেরা বিবাদ করিয়া উভয়েই উভয়ের নামে আদালতে নালিস করিল। বিচারপতি, তাহাদের কেহ সাক্ষী আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল "আমাদের সাক্ষী কেহই নাই। তবে, আমরা যখন ঝগড়া করি, তখন এক জন বৃদ্ধ, সকল গায় মাটি মাখিয়া জলের ধারে বসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া কি করিতেছিল।" ঐ সময়ে ঘাটে কে ছিল, জানিবার জন্য ত্রিবেণীতে লোক প্রেরিত হইল। অনেক অনুসন্ধানের পর বিচারক জানিতে পারিলেন, সে সময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঘাটে আহ্নিক করিতে ছিলেন। পাপ-জনক ও নীতি-বিরুদ্ধ না হউক, আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া দেশাচার বিরুদ্ধ বলিয়া প্রথমে তর্কপঞ্চানন গা. ঢাকা হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে অগত্যা তাঁহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। হাকিম সাহেবদের বিবাদের বিষয় কিছু জানেন কি না তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন—"উহাঁরা মারামারি করিয়াছেন দেখিয়াছি, দুজনের বচসাও শুনিয়াছি; কিন্তু ইংরাজী জানি না বলিয়া অর্থ বুঝিতে পারি নাই। তবে কে কাহার পর কি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন সব বলিতে পারি।" বলিয়া যে যাহাকে যাহা বলিয়াছিল পর পর সমুদায় অবি-

কল বলিলেন!! হাকিম শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলেন,—"আপনি ইংরাজী জানেন না বলিয়া আমাকে ছলনা করিতেছেন; অর্থ বুঝিতে না পারিয়া যার পর যেটী, এত কথা মনে করিয়া রাখা নিতান্ত অসম্ভব।" তর্কপঞ্চানন বলিলেন" আমি ইংরাজীর এক বর্ণও জানি না।"

ইহাতেও বিচারপতির সন্দেহ গেল না। পরিশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে, তর্কপঞ্চানন পাঁচ বছরের বেলা হইতে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রেরই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এক জন এদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

বিচারপতি দেখিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অসামান্য লোক, ইহাঁকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হয়। এই ভাবিয়া বহু সম্মানের সহিত তাঁহাকে কোন রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, কেবল আলোচনাগুণেই তর্কপঞ্চাননের স্মৃতিশক্তি এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইয়া প্রাচীন কাল পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। শুনা যায় মহাকবি কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলা তাঁহার আদ্যোপান্ত মুখস্থ ছিল।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন যেমন এদেশের এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অত্যুৎকৃষ্ট অধ্যাপক ছিলেন, তেমনই

অতি দীর্ঘ জীবনও ভোগ করিয়া গিয়াছেন। ১২১৪ সালে (১৮০৬খৃঃঅব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়ঃক্রম ১১১ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বেও পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে ৪।৫ ক্রোশ পথ চলিতে পারিতেন। তত বয়সেও দর্শন বা শ্রবণ শক্তির কিছুমাত্র অন্যথা হয় নাই। ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রামদাস তর্কবাচস্পতি (সম্প্রতি যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে), তাঁহার প্রপৌত্র ছিলেন। জগন্নাথের মৃত্যুসময়ে রামদাসের বয়স ৮। ১০ বৎসর হইয়াছিল। অনুরূপ পৌত্র ঘনশ্যামের মৃত্যুতেই জগন্নাথ শোকাকুল হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

জাতীয় ধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, এবং ঐ ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডেও বিলক্ষণ যত্ন ছিল। তিনি অতিশয় আমোদ-প্রিয় ও অমায়িক লোক ছিলেন। লোকে তাঁহাকে বড় লোক বলিয়া জানিত,—কিন্তু তিনি সে নিমিত্ত অভিমান করিতেন না।

দেখ! জগন্নাথ কেমন অসাধারণ লোক! শ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া অল্প বয়সে পণ্ডিত হইয়া পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতেন; পিতৃশ্রাদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, তাহার পর কেমন ধন উপার্জ্জন করিলেন;—দেশ বিদেশে কেমন খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেম;—দেশের কত উপকার করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

ইনি, ১১১৯ সালে (১৭১২খৃঃ) বৰ্দ্ধমানের অন্তঃপাতী 'ভুরস্থট' পরগণার মধ্যে পাণ্ডুয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়; তিনি সম্ভ্রান্ত ও বড় মানুষ ছিলেন, ভুরস্থট তাঁহার জমিদারী ছিল। তাঁহাদের প্রকৃত উপাধি মুখোপাধ্যায়; অনেক বিষয় ছিল বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা রাজা ও রায় বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করিত। নরেন্দ্রনরায়ণের চারি পুত্র। তন্মধ্যে ভারতচন্দ্র কনিষ্ঠ।

যখন ভারতের ৯। ১০ বৎসর বয়স, তখন বৰ্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা, জমীদারী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে নরেন্দ্রনারায়ণের উপর রাগ করিয়া তাঁহার বাড়ী লুঠ ও সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে নরেন্দ্রনারায়ণ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, অতিকষ্টে পরিবারের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

ভারত এই সময়ে মণ্ডলঘাট পরগণার মধ্যে গাজীপুরের নিকট নওয়াপাড়া গ্রামে আপনার মামার বাড়ী গেলেন এবং সেখানে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে লাগি-

লেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অমরকোষ অভিধানে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইলেন। পরে তাজপুরের নিকট সারদা গ্রামে কোন গৃহস্থের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী গেলেন। এই অযোগ্য বিবাহের নিমিত্ত ভাইয়েরা তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন; এবং সংস্কৃত পড়ার জন্য যৎপরোনাস্তি অনুযোগ করিলেন, কারণ সে সময়ে যবনেরা এদেশের রাজা বলিয়া সংস্কৃতের আদর ছিল না। ভারত সেই অনুযোগে অপ্রতিভ হইয়া মনোদুঃখে বাড়ী ছাড়িলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে হুগলীর উত্তর দেবানন্দপুর গ্রামবাসী কায়স্থ রামচন্দ্র মুন্সীর গৃহে উপস্থিত হইয়া পারসী পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু কোন বিষয়ের রীতিমত বর্ণনা করিয়া কাহাকেও দেখাইতেন না, মনে মনে তাহার অনুশীলন করিতেন। কবিতা লেখা অপেক্ষা এই সময়ে তিনি পারসী পড়িতেই অধিক শ্রম করিতেন। একবার রাঁধিয়া দুবেলা খাইতেন—একটী বেগুণ পোড়ার আধখানি দিন মানে খাইয়া আর আধখানি রাত্রির জন্য রাখিয়া দিতেন।

এক দিন মুন্সী মহাশয়, সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান আছে বলিয়া ভারতকে সত্যনারায়ণের পুথি পড়িতে আদেশ করিলেন। শ্রোতারা সভাস্থ হইলে মুন্সী মহাশয় এক খানি পুথি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এই অবকাশে ভারত আপন বাসা হইতে পুথি আনিবার ছল করিয়া উঠিয়া গেলেন, এবং অল্পক্ষণের মধ্যে এক খানি নূতন পুথি রচনা করিয়া সভাস্থলে আসিয়া পাঠ করিলেন। এই নূতন পুথি শুনিয়া সকলে একবাক্যে ভারতের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাদৃশ উত্তম রচনা, সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। বিশেষতঃ ভারতের বয়স তখন পনর বৎসরের অধিক নয়! এখন তাঁহার রচিত সত্যনারায়ণের পুথি দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় খানি কোন্ সময়ে কোথা থাকিয়া রচনা করিয়াছিলেন, বলা যায় না; ফলে ইহাই তাঁহার কবিত্ব-তরুর প্রথম অঙ্কুর।

ভারত, দেবানন্দপুর হইতে অনুমান ১১৩৯ সালে বাড়ী গিয়া পিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ কৃতবিদ্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইলেন। কিছু দিনের পর ভারতের পিতা পুনরায় কিছু ইজারা লইয়াছিলেন। এক্ষণে ভারত, পিতা ও ভ্রাতৃগণের আদেশে সেই ইজারা সম্বন্ধে মোক্তার হইয়া বর্দ্ধমানে গমন করিলেন। কোন সময়ে ভ্রাতৃগণ খাজানা পাঠা-ইতে বিলম্ব করায়, রাজা ঐ ইজারা খাস করিয়া লই-লেন। ভারত সেই সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়া কোনরূপে অপরাধী হওয়াতে কারারুদ্ধ হইলেন। ভারত কিছু দিন

পরে, কারারক্ষকের সহিত যোগ করিয়া, পলায়ন করিয়া একেবারে তৎকালীন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্যতম রাজধানী কটকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার দয়াবান্ সুবেদার শিবভট্টের অনুগ্রহে কিছু দিন সেখানে থাকিয়া পুরুষোত্তম গমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। শাসনকর্ত্তা তত্রত্য পাণ্ডাদিগের উপর চিঠি দিলেন। সেই চিঠি থাকাতে শ্রীক্ষেত্রের যেখানে সেখানে মাশুল না দিয়া বাস করিতে পারিতেন এবং আহারের জন্য প্রত্যহ পুরী হইতে একটী করিয়া বল-রামী আটকে* পাইতেন। সঙ্গের চাকর ও আপনি দুই জনে তাহা ভাগ করিয়া খাইতেন।

এই স্থানে থাকিয়া তিনি ভাগবত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যান্য অনেক গ্রন্থ পাঠ করেন। বৈষ্ণবদিগের দলে মিশিয়া কিছু দিন আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন।

পরে বৃন্দাবন যাইবার জন্য পুরুষোত্তম হইতে যাত্রা করিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার ভায়রা ভাইয়ের বাড়ী; ভারত আসিয়াছেন শুনিবামাত্র, ভায়রা ভাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে সংসার ধর্ম্মে উদাসীন দেখিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন। অনেক যত্নে পুনরায় সংসারী করি-

* এক নাগরী আতপ চালের ভাত, এক কটরা শালের তরকারী এবং এক কটরা অরহরের দাউল।

লেন। কিন্তু ভারত "যত দিন অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারি তত দিন বাড়ী যাইব না" বলিয়া পিতা মাতা এবং ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

এই সময়ে তিনি, ভায়রা ভাই ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সারদাগ্রামে, শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের বাড়ীতে গিয়া, কিছু দিন সুখে বাস করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রস্থান কালে শ্বশুরকে বলিয়া গেলেন "আমার পিতা কিম্বা ভ্রাতারা লইতে আসিলেও আপনকার কন্যাকে আমা-দিগের ওখানে পাঠাইয়া দিবেন না"। ইহাতে বোধ হইতেছে, কোন কারণ বশতঃ পরিবারবর্গের উপর তাঁহার মন চটিয়া গিয়াছিল।

পরে তিনি ফরাসো গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান মহা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট ফরাসডাঙ্গায় গমন করিলেন এবং আপনার পরিচয় দিয়া আশ্রয় চাহিলেন। দেওয়ান ভারতের বিদ্যা, বুদ্ধি ও পূর্ব্বাপর অবস্থার পরিচয় পাইয়া এবং সুকৌশলপূর্ণ প্রার্থনা বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "তুমি অতি যোগ্য ও সদ্বংশজাত তোমার উপকার করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ভাল! তুমি কিছু দিন এই স্থানে অবস্থান কর; আমি সবিশেষ চেষ্টায় থাকিলাম,—সুযোগ পাইলেই তোমার মঙ্গল সাধন করিব।" এই কথায় ভারত সন্তুষ্ট হইয়া সেই খানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ঐ দেওয়ান চৌধুরীর নিকট, মধ্যে মধ্যে টাকা ধার করিতে আসিতেন। এক দিন, তিনি ফরাসডাঙ্গায় উপস্থিত হইলে, চৌধুরী মহাশয় ভারতের পরিচয় দিয়া তাঁহার প্রতিপালনের নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজা তাঁহাকে রাজধানী যাইতে কহিয়া গেলেন। অনন্তর, ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরে গমন করিলে, মাসিক ৪০ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া বাসা দিলেন। তিনি প্রতিদিন, প্রাতে ও সন্ধ্যা-কালে, দুইটী কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইতেন। রাজা ভারতের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধি দিলেন এবং পরস্পর অসম্বদ্ধ উদ্ভট কবিতা রচনা করিতে নিষেধ করিয়া মুকুন্দরাম চক্র-বর্ত্তীর * চণ্ডীর প্রণালীতে অন্নদামঙ্গল কাব্য লিখিতে অনুমতি করেন। ভারত তাঁহার আজ্ঞায় পরম যত্নে অন্নদামঙ্গল রচনা করেন, "বিদ্যাসুন্দর" প্রস্তাব ও উহার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ভারত, অন্নদামঙ্গল রচনাবিষয়ে রাজার আজ্ঞাপ্রাপ্তি, তদীয় গ্রন্থের বহু-স্থলে স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

* যদিও ইহাঁর পূর্ব্বে দুই এক জন বঙ্গ ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতরূপে ইহাঁকেই বঙ্গ ভাষায় প্রথম ও প্রধান কবি বলা যাইতে পারে। ইনিই "কবিকঙ্কন" বলিয়া খ্যাত।

"আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।"

কিছু দিন পরে, বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত রসমঞ্জরীর অনুবাদ করিলেন। ঐ সকল গ্রন্থের রচনা অতি উত্তম। অধিক কি, ঐ সকল পুস্তকের ন্যায় সুললিত ও ভাব শুদ্ধ কবিতা অতি বিরল। কিন্তু উহার অধিকাংশ এতাদৃশ অশ্লীল যে, নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে পাঠ করিলেও পাঠককে লজ্জিত হইতে হয়। অশ্লীলতা দোষে দূষিত না হইলে অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন ও মধ্য কালের কবিগণের কাব্য, সাহিত্যসমাজের প্রধান সম্পত্তি হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য, এবং ইহা দ্বারাই তিনি বিখ্যাত হইয়াছেন। যখন অন্নদামঙ্গল রচনা করেন, তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর।

রায় গুণাকর আপনার অসাধারণ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য গুণে নবদ্বীপাধিপতির প্রিয়পাত্র হইয়া সম্মানের সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এক দিন, রাজা কথায় কথায় তাঁহার সংসার ধর্ম্মের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। ভারত বলিলেন,—"আমার স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়াছি এবং ভ্রাতৃগণের সহিত আমার প্রণয় না থাকায় আর বাড়ী যাইবার অভিলাষ নাই; তবে উপযুক্ত স্থান পাইলে ঘর দ্বার বাঁধিয়া সংসার

ধর্ম্ম করিতে অভিলাষ আছে।” ইহাতে রাজা বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য কিছু টাকা এবং গঙ্গার ধারে মূলা-যোড় গ্রামে বৎসরে ৬০০৲ আয়ের ইজারা দিয়া তথায় বাস করিতে কহিলেন।

ভারত ঐ টাকা ও ইজারার সনন্দ লইয়া মূলাযোড়ে গিয়া, তত্রত্য ঘোষালদিগের একটী বাড়ী ভাড়া করিলেন; এবং স্ত্রীকে তথায় আনিয়া যত দিন নূতন গৃহ প্রস্তুত না হইল, তত দিন সেই বাটীতেই রহিলেন। ভারত, গঙ্গার ধারে বাড়ী করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার পিতাও আসিয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে, তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। ভারত যথাবিধি পিতৃ-কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পুনরায় কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া নানা বিষয়িণী কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি, কখন কৃষ্ণনগরে, কখন মুলোযোড়ে, কখন বা ফরাসডাঙ্গায় বাস করিতেন।

নবাব আলিবর্দ্দির অধিকার কালে যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য (যাহা বর্গীর হঙ্গাম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে) অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল,—সেই সময়ে বর্দ্ধমানের রাজা তিলকচন্দ্রের মাতা, তাহাদিগের ভয়ে পলাইয়া আসিয়া, মূলাযোড়ের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কাউগাছি গ্রামে বাস করেন। বাসস্থানের নিতান্ত নিকট বলিয়া মূলাযোড় গ্রামখানি পত্তনি লইবার মানসে কৃষ্ণনগরের

রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন, তিনিও দিতে সম্মত হইলেন। তাহাতে ভারতচন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া "আমি কোথায় যাইব" বলিয়া রাজাকে জানাইলে, তিনি আনরপুরের অন্তঃপাতী গুস্তেগ্রামে ১৫০/০ বিঘা ও মূলাযোড়ে ১৬/০ বিঘা ভূমির স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দান করিলেন ও গুস্তেতে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। তিনি যেখানে বাস করিতেছিলেন, সেখানকার লোকেরা তাঁহার গুণে এতাদৃশ বাধিত হইয়াছিল যে, তিনি এখন ঐ স্থান ছাড়িতে উদ্যত হইলে, তাহারা তাঁহাকে কোন ক্রমেই ছাড়িল না; সুতরাং তাঁহাকে মূলাযোড়েই থাকিতে হইল।

বৰ্দ্ধমানের রাণী, রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় পত্তনি লইয়াছিলেন। ঐ নাগ, কর্ত্তা হইয়া গ্রামবাসিদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। ভারত, তাহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং আপনিও নাগের দংশনে পীড়িত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় "নাগাষ্টক" নামে আটটী কবিতা রচনা করিয়া কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দিলেন। এই লেখাতে ভারত কিছু বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠ করিয়া রাজা এককালে শোক ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই নাগ-কৃত অত্যাচার নিবারণ করিয়া দিলেন। পণ্ডিত মাত্রেই নাগাষ্টকের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ভারত বাঙ্গালা ভাষায় প্রশংসনীয় কবিতা লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সংস্কৃত, পারসী, হিন্দী, ব্রজবুলি প্রভৃতিতেও কবিতা রচনা করিয়া, সেই ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতের পূর্ব্বে কবিকঙ্কণ, কৃত্তি-বাস, কাশীদাস প্রভৃতি অনেকে বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ছন্দো-লালিত্য ও রচনা-চাতুর্য্যে কেহই ভারতের ন্যায় ছিলেন না।

আক্ষেপের বিষয় এই, যিনি বাল্যকাল হইতে যার পর নাই শ্রম ও কষ্ট করিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন; যিনি পনর বৎসর বয়সের সময়ে অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; যিনি পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব গুণে সর্ব্বত্র মান্য হইয়াছিলেন; পণ্ডিতগণ যাঁহার গ্রন্থ আদর পূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে পাঠ করেন; যাঁহার উদ্ভাবিত ছন্দঃপ্রণালী আধুনিক অনেক কবির আদর্শ হইয়া রহিয়াছে, সেই মহামহোপাধ্যায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ৪৮ বৎসর বই পৃথিবীতে ছিলেন না। ১১৬৭ সালে (১৭৬০ খৃঃ অব্দে) বিষমাগ্নি * রোগে প্রাণত্যাগ করেন!! মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে রোগমুক্ত

* হিন্দু বৈদ্যকের মতে উদরাগ্নি তিন প্রকার;—সমাগ্নি, মন্দাগ্নি ও বিষমাগ্নি। এই বিষমাগ্নি রোগকে ভস্মকীট বলিয়া থাকে।

করিবার জন্য বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারেন নাই।

দেখ! রায় গুণাকর প্রথম বয়সে কত কষ্ট পাইয়াছিলেন ; ৮। ৯ বৎসর বয়সের সময় বাড়ী ছাড়েন ; পরপ্রত্যাশী হইয়া বেগুনপোড়া ভাত খাইয়া লেখা পড়া শিখেন ; মোক্তারী করিতে গিয়া কাটকে যান ; ভ্রাতৃগণের সহিত প্রণয় না থাকায়, গৃহত্যাগী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করেন, ফরাসডাঙ্গায় কত দিন পরান্নে শরীরপোষণ করেন ! ! তথাপি লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, যে শ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, কেবল তাহার গুণেই শেষ দশায় এত সুখী হয়েন। তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রধান আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন !

ভারত, মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে "চণ্ডী" নামে এক খানি বাঙ্গালা-হিন্দী-মিশ্রিত নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অবিবেচক কাল উহা তাঁহাকে সম্পূর্ণ করিতে দেয় নাই। এই খানির লেখা সাঙ্গ হইলে এক অপূর্ব্ব পদার্থের সৃষ্টি হইত।

কৃষ্ণ পান্তী *।

কৃষ্ণ পান্তী ধনী ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত; তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত প্রীতিকর ও কৌতুকাবহ; এই নিমিত্ত তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সঙ্কলন করিলাম।

কৃষ্ণ পান্তী, নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী রাণাঘাট গ্রামে, (১৭৪৯খৃঃ) ১১৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, তিলি কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সহস্ররাম পান্তী; তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন, পান বিক্রয় করিয়া অনেক কষ্টে পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন। তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল; তন্মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠ। যখন কৃষ্ণনগরে, রাজা রঘুরাম রায় রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে "জড়ানেতলায়" (বর্ত্তমান রাণাঘাটের পূর্ব্বপ্রান্ত) কতকগুলি দস্যু বাস করিত। রণা নামক এক ব্যক্তি ঐ দস্যুদলের অধ্যক্ষ ছিল। রণার বাসস্থানের এক মাইল

---

* ইহাঁর জাতীয় উপাধি পাল; পিতার পান বিক্রয়ের ব্যবসায় হইতেই পান্তী বলিয়া খ্যাত হন। এই শ্রুতিই দেশে খ্যাত। কিন্তু তদ্বংশীয় কোন ব্যক্তি বলেন, "পান্তী" শব্দ পানেরই রূপান্তর।

উত্তর-পশ্চিম মাতাভাঙ্গার (চুর্ণী নদীর) নিকট নিবিড় বন ছিল। ঐ বনে রণার ঘাটি (আড্ডা) ছিল। সে তথা দলবল সহিত লুক্কায়িত হইয়া দস্যুবৃত্তির পরামর্শ করিত এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি গুপ্ত করিয়া রাখিত। রণার দস্যু-কালীই, রাণাঘাটের মধ্যস্থলবর্ত্তিনী বর্ত্তমান সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী গ্রাম্য প্রতিমা। রণা এবং ঘাটি এই দুই শব্দ হইতেই রাণাঘাট নামের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব রাজা রঘুরামের রাজ্যকাল হইতে গণনা করিলে, বোধ হয়, দুই শত বৎসরের মধ্যেই রাণাঘাটের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে।

কিরূপে রণা দস্যুর বিনাশ হইল, কিরূপে কোথা হইতে কোন্ কোন্ জাতি আসিয়া এখানে বাস করিল, কিরূপেই বা সেই দস্যুপূর্ণ নিবিড়ারণ্য, চূর্ণী ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের মধ্যবর্ত্তী রাণাঘাটরূপে পরিণত হইল, এস্থলে তাহার সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নহে। তিলি জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংগ্রহ করা আবশ্যক হইতেছে। যে হেতু, এদেশীয় অনেকেরই তিলি জাতিকে নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া সংস্কার আছে। কেহ কেহ তিলির হাতের জলগ্রহণ পর্য্যন্তও করেন না। এদেশের তিলিরা জলাচরণীয় "নবশাকের" অন্তর্গত। আমরা সবিশেষ জানি তাম্বুলী ও তৈলিক, প্রতিলোম-ক্রমে বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত। গুবাক-

বিক্রয়, উহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। শব্দকল্পদ্রুমে নবশাক জাতি বিষয়ে পরাশরের এই বচন যথা ;—

"গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারজি,
কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নব শায়কঃ।"

পশ্চিম অঞ্চলে কলুকে তিলি বলে। কারণ কলুর অভিধান তৈলিক, তৈলিকের অপভ্রংশ তিলি। বোধ হয়, পশ্চিমের ব্যবহারকে আদর্শ করিয়াই, এদেশের কেহ কেহ তিলিকে নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণা করেন।

রাণাঘাটের তিন ক্রোশ পূর্ব্ব, গাংনাপুর নামে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। বহুদিন ধরিয়া সেখানে একটী হাট বসিয়া থাকে, ব্যবসায়িরা অনেক দূর হইতে, নানা-বিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া কেনা বেচা করিতে আইসে। সহস্ররামও তথায় প্রতি হাটে পান বেচিতে যাইতেন। সমস্ত দিন পান বেচিয়া যাহা কিছু লাভ হইত, তাহাতে সংসারের আবশ্যক দ্রব্যাদি এবং ছোট ছোট ছেলেদের জন্য কতকগুলি মুড়ির মোওয়া লইয়া সন্ধ্যা-কালে ফিরিয়া আসিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র, আপনার ভাই ও অন্য অন্য পাড়ার সাথীগণের সহিত আমোদ করিয়া মোওয়া খাইতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে, পিতার সঙ্গে হাটে যাইতেন ; ক্রমে বড় হইয়া সেই ব্যবসায়েই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে, তিনি রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী কুমারঘাটি-পুরের কৃপারাম দত্ত ও বৈদ্যপুরের আনন্দিরাম বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সহিত প্রণয়ে মিলিত হইয়া, ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কৃপারাম দত্ত, বয়সে ও ধনে অপর দুই জন অপেক্ষা বড় ছিলেন। ইহাঁর একটি বলদ ছিল। ইহাঁর বিক্রেয় দ্রব্য সামগ্রী বলদের পিঠে যাইত; কৃষ্ণ ও আনন্দিরামকে আপন আপন ব্যবসায়িক দ্রব্য, নিজে নিজেই বহন করিতে হইত। ইহাঁরা তৎ-কালে নিকটবর্ত্তী সাতটী হাট করিতেন।

এইরূপে কিছু সংগতি করিয়া, তিনি কয়েকটী বলদ ক্রয় করিলেন। রাণাঘাটের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে, কায়েতপাড়া নামে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; ঐ গ্রামে কতকগুলি "তুষকোটা" তিলি বাস করে,—তাহারা বলদ চালানর ব্যবসায় করিত। কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া ঐ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কোন স্থানে কোন জিনিস সস্তা শুনিলেই, সেখানে গিয়া তাহা ক্রয় করিতেন এবং বলদের পিঠে বোঝাই দিয়া, যেখানে ঐ দ্রব্য মহার্ঘ, সেই স্থানে গিয়া বেচিয়া ফেলিতেন। এই-রূপ বিবেচনা পূর্ব্বক, কিছুকাল চাল, ছোলা, মটর, যব, গোম, সরিষা, ধূলেপুরে ধান, খঞ্জের কাঠ প্রভৃতির ব্যবসায় করায়, আরও কিছু আয় বৃদ্ধি হইল।

অতঃপর, কৃষ্ণ পান্তীর ভাগ্যতরুতে আশার অতিরিক্ত

ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। ১১৮৬ সালে (১৭৮০খৃঃ অব্দে) কলিকাতা সহরে ছোলা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। বস্তু দুষ্প্রাপ্য হইলেই দুর্মূল্য হইয়া উঠে। এই সময়ে, কলিকাতায় ছোলা বিক্রয় ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ দেখিয়া, বহু সঙ্খ্যক মহাজন, ছোলার অনুসন্ধানে চারি দিকে গমন করিল।

এই সকল মহাজনের মধ্যে এক জন, নৌকাযোগে চূর্ণী নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া, রাণাঘাটের যে ঘাটে কৃষ্ণ পান্তী স্নানাহ্নিক করিতেছিলেন, সেই ঘাটে নৌকা বাঁধিলেন। তাঁহাকে মহাজন বলিয়া চিনিতে পারিয়া কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? প্রয়োজন কি? এবং কোথা যাই-বেন?" মহাজন উত্তর করিলেন,—"কলিকাতা হইতে আসিয়াছি; কোথায় যাইব তাহার ঠিকানা নাই। কোথায় গমন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এখনও তাহা জানি না।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, কৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন,—"আপনি যদি আমাকে সওদাপত্র লেখা পড়া করিয়া দেন—আমি ছোলা আমদানী করিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া মহাজন লেখা পড়া করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সেই সওদাপত্র হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আড়ংঘাটায় "যুগলকিশোর" নামে এক দেববিগ্রহ

আছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার নামে অনেক বিষয় করিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে বিগ্রহসেবা, অতিথিসেবা ও বহু নাগা সন্ন্যাসীর নিত্য ভরণপোষণ প্রভৃতি নির্ব্বাহিত হইয়াও বৎসর বৎসর অনেক টাকা বাঁচিত। সেই দেবগৃহের মোহান্ত বা অধ্যক্ষ, ঐ টাকায় মহাজনী ও তেজারতী করিয়া আরও বিষয় বাড়াইতেন। এইরূপে যুগলকিশোরের অনেক বিষয় হইয়াছে। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন গঙ্গারাম মোহান্ত, ঠাকুর-বাড়ীর অধ্যক্ষ ছিলেন।

তিনি এক দিন দেখিলেন, পোকা লাগিয়া চারি পাঁচ গোলা ছোলা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। উপরকার ছোলার কিছুই নাই, একেবারে খোসা করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি উপর দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, হয় ত সমুদায় ছোলাই ঐরূপ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ বিষণ্ন হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন—"ছোলা গুলি সমুদয় পোকায় নষ্ট করিল! তলায় এখনও কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু আর কিছু দিন পরে সব মাটী হইবে, অতএব এখন কোন খরিদ-দার আসিয়া যে দর বলিবে তাহাতেই ছাড়িয়া দিতে হইবে,—আর রাখা হয় না।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হই-তেছে, এমন সময়ে কৃষ্ণ পান্তী গিয়া উপস্থিত।

কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার আড়ংঘাটায় আগমনের অভিপ্রায়

প্রকাশ করিলে মোহান্ত কহিলেন, "আমরা সমুদয় ছোলাই বিক্রয় করিব।" কৃষ্ণ পান্তী বলিলেন—"আমি দুঃখী, আগে সমস্ত টাকা দিয়া লই এমন ক্ষমতা নাই, তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া, মূল্য এবং পরিমাণ অবধারণ পূর্ব্বক লেখা পড়া করিয়া, যদি জিনিস ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমি বিক্রয় করিয়া আপনাকে টাকা দিতে পারি। আপনার চরণপ্রসাদে আমার কিছু থাকে ইহাই প্রার্থনীয়। আর আমি দেখিলাম, সকল গোলার জিনিসই ২।৩ হাত করিয়া একেবারে শস্যহীন হইয়াছে;—সে সব ভূসির দরেই বিক্রীত হইবে; অতএব আমার বিবেচনায় সমস্ত ছোলার দুই দর হওয়া উচিত।" এই কথা শুনিয়া মোহান্ত কহিলেন—"তুমি অতি ধার্ম্মিক লেখা পড়ার আবশ্যকতা নাই—আমি সমুদায় ছোলাই তোমাকে দিব—শস্যযুক্ত ভাল মন্দ উভয়েরই প্রতিমণ ৷৹ আনা এবং শস্যহীনের প্রতিমণ ৵৹ আনা দর সাব্যস্ত থাকিল। ইহাতে কিছু লাভ হয়, সে তোমার—ক্ষতি হয় বিবেচনা করিব,—তোমাকে দায়গ্রস্ত হইতে হইবে না।" তিনি মোহান্ত ঠাকুরের ঐ কথায় সম্মত ও সন্তুষ্ট হইলেন। পরে, সেই স্থানে আহারাদি করিয়া, দুই প্রকার ছোলার নমুনা সমেত রাণাঘাটে আসিয়া, সেই মহাজনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আসিবার সময়, মোহান্ত ঠাকুরের পায় একটী টাকা দিয়া, প্রণাম করিয়াছিলেন।

জিনিস দেখাইয়া, মহাজনকে তাহার মূল্যাবধারণ করিতে কহিলেন। মহাজন তাহার তিন প্রকার মূল্য স্থির করিলেন ;—উত্তমের প্রতিমণ ২৲ টাকা, মধ্যমের ১॥০ টাকা এবং ভূসির ।৵০ আনা। কৃষ্ণ পান্তী ইহাতে সম্মত হইলে, বায়না-পত্র লেখা পড়া এবং বায়নার টাকা প্রদত্ত হইল। তিনি, বায়নার টাকা ও সেই মহাজনকে সঙ্গে লইয়া আড়ংঘাটায় গিয়া, সমস্ত ছোলা মাপাইয়া দিলেন। মহাজন নৌকা বোঝাই করিয়া রাণাঘাটে প্রত্যাগমন করিলেন। হিসাব করিয়া মহাজনের কাছে কৃষ্ণ পান্তীর ১৩৮৭৫৲ টাকা পাওনা হইল। মহাজন অবিলম্বে সমুদয় টাকা চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। এস্থলে কৃষ্ণ পান্তীর কি লাভ হইল, মোহান্তই বা কি পাইলেন, সবিশেষ জানিবার জন্য, বোধ হয়, পাঠকের কৌতূহল জন্মিতে পারে ; এই নিমিত্ত নিম্নে তাহার হিসাব দিলাম *।

---

* রাণাঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কোন প্রাচীন লোকের লিখিত "রাণাঘাটের বিবরণ" বলিয়া এক খানি পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ হিসাব দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু জয়চাঁদ পাল চৌধুরী বলেন, মোহান্ত কেবল দয়াপরবশ হইয়া প্রথমে কৃষ্ণ পান্তীকে ত্রিশ টাকার ছোলা দেন। কৃষ্ণ পান্তী সেই ছোলা বেচিয়া মোহান্তকে টাকা দিয়া, আবার অধিক টাকার ছোলা পান। এইরূপেই তাঁহার উন্নতি হয়।

উত্তম ছোলা ... ... ৩০০০/০ × ২৲ = ৬০০০৲
মধ্যম ঐ ... ... ৫০০০/০ × ১৷৷০ = ৭৫০০৲
ভূসি.... ... ... ১০০০/০ × ৷৶০ = ৩৭৫৲

১৩৮৭৫৲
মোহান্তের প্রাপ্য—৬১২৫৲

কৃষ্ণ পান্তীর লাভ = ৭৭৫০৲

মোহান্তের প্রাপ্য।

উত্তম মধ্যম ছোলা ৮০০০/০ × ৸০ = ৬০০০৲
ভূসি ১০০০/০ × ৵০ = ১২৫৲

৬১২৫৲

বোধ হয়, ইহাঁর বিষয়ে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী এই সময়েই কল্পিত হইয়া থাকিবে। তাহা এই,—এক দিন প্রাতঃকালে, কৃষ্ণ পান্তী বাড়ীর নিকটবর্ত্তী চূর্ণী নদীতে হাত মুখ ধুইতে গিয়াছিলেন। নদীর ধারে এক পরমাসুন্দরী কামিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ সময়ে নদী বাহিয়া ৭টী মুখ-বদ্ধ ঘড়া ভাসিয়া যাইতেছিল। সেই কামিনী তাঁহাকে বলিলেন "ঐ ঘড়াটী লও।" কৃষ্ণচন্দ্র নিকটে যাইবামাত্র অপর ছয়টী ডুবিয়া গেল; কেবল সেই স্ত্রীর নির্দ্দেশিত ঘড়াটী ভাসিতে লাগিল। গৃহে আনিয়া দেখেন, ঘড়াটী ধনে পরিপূর্ণ!!

এখন কৃষ্ণ পান্তী, সামান্য ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে যে টাকা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া

কলিকাতা গমন করিলেন। হাটখোলায় একটু জমী পাট্টা করিয়া লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। তত্রত্য ব্যবসায়িগণের সহিত প্রণয় হইল; তাহাদিগের দ্বারা ব্যবসায় কার্য্যের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঐ সকলের মধ্যে এক জন আত্মীয় বণিকের মুখে শুনিলেন, কোম্পানির গোল্লানে লবণ ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ সম্ভাবনা। এই সন্ধান পাইয়া তিনি কয়েক জন ভদ্র বণিকের সহিত, ভাগে লবণব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন এইরূপে যায়।

চিরকাল পরবশ থাকা ভাল লাগে না; এখন কৃষ্ণ পান্তীর স্বাধীন হইয়া ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা হইল। বিনয় বাক্যে অংশিদারদিগকে অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহারা সম্মত হইলে, তিনি আপন মূলধন ও লাভাংশ লইয়া পৃথক্ হইলেন। শুনা যায়, এবারে ৩০০০০ ৲ টাকা লাভ পাইয়াছিলেন। এই সময় হইতে দোকানি, পসারি, মুটে, ঘেটেল; গাড়োয়ান প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রকে বড় লোক বলিয়া মানিতে লাগিল। স্বয়ং ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন; ধর্ম্মজ্ঞান থাকাতে চারি দিকে সম্ভ্রম বাড়িয়া গেল; জলের ন্যায় পয়সা আসিতে লাগিল। কৃষ্ণচন্দ্র কিছু দিনের মধ্যে ফাঁপিয়া উঠিলেন। সল্টবোর্ডের সাহেবের নিকট তাঁহার এত পসার হইল

যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে অপরেরা লবণের লাট ক্রয় করিত না—নিলাম *বন্ধ থাকিত। ক্রমে এমন হইয়া উঠিল, নিলামের সময় কৃষ্ণ পাস্তীর ন্যায় অধিক লাট আর কেহই কিনিয়া উঠিতে পারিত না।

কি বণিক্‌গণ, কি পোক্তান ও চৌকির কর্ম্মচারিগণ, সকলেই ভাব গতিক দেখিয়া কৃষ্ণ পাস্তীর বশীভূত হইল। তিনি, কলিকাতার বণিক্‌-সম্প্রদায়ের মস্তক স্বরূপ হইয়া উঠিলেন; তিনি যাহা করিবেন, সকলেই তাহা করিবে, তিনি যাহা না করিবেন, কেহই তাহা করিবে না। এই সময়ে, তিনি হাটখোলার "কর্ত্তা বাবু" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তখন, কলিকাতা সহরে এমন লোক ছিল না, যে তাঁহাকে জানিত না। এক জন সামান্য দোকানদার হইতে গবর্ণর জেনারেল পর্য্যন্ত সকলেই জানিতেন—কৃষ্ণ পাস্তী এক জন প্রধান ধনী ও প্রধান বণিক।

কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে, মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের পরামর্শে বহু সংখ্যক তালুক ক্রয় করা হইয়াছিল। ১২০১ সালে (১৭৯৪খৃঃ) মামজোয়ান পরগণা ইজারা লওয়া হয়।

* তখন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের লবণ নিলামে বিক্রয় হইত, ওজন কি দর দাম, কিছুই ছিল না। নিলামঘরে সকল খরিদদারকেই বেঞ্চে বসিতে হইত, কেবল কৃষ্ণ পাস্তীই সেক্‌রেটারির সম্মুখে চৌকী পাইতেন।

১২০২ সালে, দেঁতে পরগণা খরিদ হয়। ১২০২ ও ১২০৬ সালের (১৭৯৫ ও ১৭৯৯ খৃঃ) মধ্যে সাঁতোর পরগণা খরিদ হয়। হাল্‌দা পরগণাও এই সময়ে ক্রয় করা হয়। সল্টবোর্ডে কৃষ্ণ পান্তী যেমন সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, রেবিনিউ বোর্ডেও সেইরূপ। ইহা দেখিয়া কতকগুলি বড় মানুষ, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করেন। সাঁতোর নিলামের সময়, তাঁহারা উহার অনেক ডাক বাড়াইয়া দেন এবং ময়লা কাপড় পরা অসভ্য তিলি বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করেন। কৃষ্ণ পান্তী, শেষে রেবিনিউ অধ্যক্ষকে বলিলেন,—"যে যত ডাকিবে,—তাহার উপর আমার হাজার টাকা ডাক রহিল।" ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা কেবল তালুকের দাম বাড়াইয়া দিলেন এই মাত্র, কৃষ্ণ পান্তীকে পারিয়া উঠিলেন না। কৃষ্ণ পান্তী, এই সময়ে কত দূর ধনশালী হইয়াছিলেন এবং তৎকালবর্ত্তী বড় মানুষদিগের অবস্থাই বা কিরূপ ছিল, উপরি উক্ত ঘটনায় তাহা সুন্দররূপ বুঝা যাইতেছে।

রাণাঘাট গ্রাম ১২০৬ সালে ক্রয় করা হয়। পূর্ব্বে, ইহা কৃষ্ণনগর রাজসংসারের অধীনে ছিল। কৃষ্ণ পান্তীর এমনই পড়তা পড়িয়াছিল—যে দিকে চালিতেন সেই দিকেই জয় লাভ হইত!! জমীদারী পক্ষেও বিলক্ষণ উন্নতি হইল। ইহাঁর পিতা সহস্ররামের সময়ে, ইহাঁদিগের অতি যৎসামান্য বাটী ছিল, বর্ত্তমানে তাহার কোন

চিহ্ন নাই, উহা চুর্ণীর অপর পারে সমভূম হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আবাসবাটী, উদ্যানবাটী, গোলাবাটী, গোমহিষ-শালা, অশ্বশালা প্রভৃতি সকলই অট্টালিকাময় হইল; মহোৎসব বাটী, গুঞ্জবাটী * প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তুত হইল। হাতি, ঘোড়া, নিশান, নৌকা প্রভৃতি যাহা যাহা শ্রীমন্তের ঘরে থাকা আবশ্যক, সমুদায়ই প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইল। দানধ্যান, কর্ম্মকাণ্ড মহা সমারোহে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। রাজগুণান্বিত শম্ভুচন্দ্রের প্রতি জমীদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল; উপাধি, পাল হইতে "পালচৌধুরী" হইল। তাঁহার দানে লুব্ধ হইয়া নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণেরা রাণাঘাটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই! সমৃদ্ধির এক শেষ!

কৃষ্ণ পান্তীর পাল চৌধুরী হইবার বিবরণ এইরূপ। তাঁহার উন্নতির সময়ে, কৃষ্ণনগরের রাজারা তাঁহার নিকট টাকা কর্জ্জ করিতেন। এই উপকারের চিহ্নস্বরূপ মহারাজা শিবচন্দ্র তাঁহাকে "চৌধুরী" উপাধি প্রদান

---

* যে বাটীতে রথ, রাস, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি হইয়া থাকে, এক্ষণে শ্রীগোপাল পালচৌধুরীর পুত্রেরা যে বাটীতে বাস করিতেছেন, তাহাই কৃষ্ণ পান্তীর গুঞ্জবাটী ছিল। উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর পুত্রেরা যে বাটীতে বাস করিতেছেন, তাহাই মহোৎসব বাটী ছিল। ব্রজনাথ পাল চৌধুরী কৃষ্ণ পান্তীর বসত বাটীতে বাস করিতেছেন।

করেন। তৎকালে ঐ উপাধিটী ধনাঢ্যগণের মধ্যে অত্যন্ত আদরের ও সম্মানের বিষয় ছিল। সুতরাং ঐ উপাধি লাভে কৃষ্ণ পান্তীর সম্ভ্রমের সীমা রহিল না।

প্রবাদ আছে, ঐ সময়ে লর্ড ময়রা বাহাদুর মফঃসল বেড়াইতে বাহির হইয়া, রাণাঘাটের নিকটে কয়েক দিন অবস্থিতি করেন। কৃষ্ণ পান্তী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করেন এবং বসিবার জন্য একটী "মোড়া" দিবার আদেশ দেন। এই সময়েই গবর্ণর বাহাদুর তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিতে চান। তৎকালে, দেশীয় রাজারাই দেশের প্রধান ছিলেন এবং ইংরাজ রাজের তাদৃশ সম্মান বৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং কৃষ্ণ পান্তী রাজদত্ত "চৌধুরী" উপাধি অপেক্ষা "রাজা" উপাধি অধিক গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তিনি সহজেই বলিয়াছিলেন যে, নবদ্বীপাধিপতি যখন তাঁহাকে চৌধুরী উপাধি দিয়াছেন, তখন আর তাঁহার রাজা উপাধিতে প্রয়োজন কি? লর্ড বাহাদুর ইহাতে রাজা উপাধির পরিবর্ত্তে "চৌধুরীর" পূর্ব্বে তাঁহার জাতীয় উপাধি "পাল" শব্দ যোগ করিয়া তদবধি "পাল-চৌধুরী" উপাধি প্রচলিত করিয়া দিলেন; এবং রাজোচিত সম্মান দানের নিদর্শনস্বরূপ নহবৎ বাজান ও আসা-সোটা ব্যবহারের আদেশ দিলেন। কৃষ্ণ পান্তীকে

এই সম্মান দানের আদেশ, তৎকালীন সরকারী দপ্তরে লিপিবদ্ধ হয়।

শুনা যায়, তাঁহার নানা স্থানস্থিত লবণের গদি হইতে বৎসর বৎসর নির্দ্দিষ্ট দিনে লাভের টাকা আসিত। ঐ টাকা রাশীকৃত হইয়া কোন গৃহে রুদ্ধ থাকিত; তিন চারি দিন পরে পরিবারদিগকে ডাকিয়া ঐ গৃহের দ্বার খোলা হইত এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব প্রাপ্য বার্ষিক টাকা লইতে আদেশ করা হইত। পরিবারেরা আপন আপন বার্ষিক গণিয়া লইত না,—কাঠা-পালী করিয়া মাপিয়া লইত। কেহ এক পালী, কেহ আধ কাঠা, কেহ এক কাঠা,—কেহ বা তদধিক টাকা লইয়া প্রস্থান করিলে, অবশিষ্ট টাকা ধনাগারে থাকিত।

অর্থ এমন জিনিস নয় যে, চিরকাল কোন ব্যক্তির স্বভাব অবিচলিত রাখে। ইহার প্রলোভিনী শক্তি এত প্রবল যে, যিনি যতই সাবধান হউন, অনেক দিন ধরিয়া অর্থের সহিত কারবার করিতে হইলে, একটা না একটা অধর্ম্মে পড়িতেই হয়। জনশ্রুতি আছে, কৃষ্ণ পান্তী একবার মাত্র সেই অপবাদে পড়িয়াছিলেন।

কৃষ্ণ পান্তী দেখিলেন, তাঁহার উপর সল্টবোর্ডের সাহেবের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে; দোকানচৌকী ও হাট বাজারের সকল লোকেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছে; সকলেই তাঁহাকে বড় বলিয়া মানিতেছে;

ঘুস দিবার টাকারও অপ্রতুল নাই ; অতএব তিনি লবণ চুরি করিতে আরম্ভ করিলেন ; ইহার পূর্ব্বে ভদ্রেশ্বর, কালনা, হাঁসখালি, ঢাকা, মুরশিদাবাদ, নারায়ণগঞ্জ, সেরাজগঞ্জ, নলহাটী, পাটনা, কাঞ্চননগর প্রভৃতি স্থানে গদি করিয়াছিলেন। অপহৃত লবণ সেই সকল স্থানে চালান দিতে লাগিলেন ; এবং সেই সেই স্থান হইতে নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী কলিকাতায় আমদানী করিতে লাগিলেন। ইহাতে অসম্ভব লাভ হইতে লাগিল ; এই রূপে কিছুদিন যায়। কেহ কেহ বলেন, এক দিন ধরা পড়িবার উপক্রম হওয়ায়, কৃষ্ণ পান্তী, কিস্তীর তলা ফাঁসাইয়া সমস্ত লবণ জল-মগ্ন করাতে আর কিছুই হয় নাই। শুনা যায়, তিনি ঐরূপ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অধ্যক্ষ সাহেবকে লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। বিভবের কথা যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহা বলা অসঙ্গত হয় না যে, উন্নতির সময়ে কৃষ্ণ পান্তী লক্ষ টাকাকে সামান্য জ্ঞান করিতেন। কৃষ্ণ পান্তী লেখা পড়া জানিতেন না ; কিন্তু নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা স্মৃতি শক্তি এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, মনে মনে অনেক টাকার হিসাব রাখিতে পারিতেন। কখন কখন সেই স্মৃতি শক্তির প্রভাবে, কর্ম্মচারিগণের কাগজ পত্রের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন।

কৃষ্ণ পান্তী, নানা প্রকারে, দেশের লোকের উপ-

কার করিয়াছিলেন। কাহাকে বাড়ীতে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, কাহাকে বাণিজ্য কার্য্যের ভার দিয়া, কাহাকেও বা নগদ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ পান্তীর টাকায় যে, কত লোক বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে, বলা যায় না। রাণাঘাটে যত কোটা দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় তাহার বার আনা, কৃষ্ণ পান্তীর টাকার ফল। কেবল রাণাঘাটে কেন? যেখানকার যে ব্যক্তি, একবার কৃষ্ণ পান্তীর ছায়া স্পর্শ করিয়াছে, সেইই ৪।৫ পুরুষ চলিতে পারে, এমন কায করিয়া লইয়াছে।

মানুষ চিনিতে পারা একটী অনুকরণীয় গুণ। কৃষ্ণ পান্তীর তাহা বিলক্ষণ ছিল; অনেকে তাহার প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত গল্প করিয়া থাকেন।

রাণাঘাটের ২ ক্রোশ দক্ষিণে, বৈদ্যপুর নামে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। একদা, কৃষ্ণ পান্তী ঐ স্থানে একটা পুষ্করিণী কাটাইতেছিলেন। পুকুর কাটিবার পূর্ব্বে, কর্ত্তাকে দুই কোদাল মাটী কাটিতে হয়। সেই উদ্দেশে, কৃষ্ণ পান্তী এক দিন, উক্ত স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তিনি গিয়াছেন বলিয়া অনেক লোক যুটিল। এই সময়ে, পুষ্করিণীকালীর প্রয়োজন হওয়াতে, তাঁহার নিয়োজিত লোক জন কেহই তাহা কষিতে পারিল না। তখন ঘটী-হাতে একটী ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি উত্তমরূপে ঐ অঙ্ক কষিয়া দিলেন। কৃষ্ণ পান্তী, ইহাতে

সন্তুষ্ট এবং জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তাঁহাকে রাণাঘাটে যাইতে বলিয়া, প্রত্যাগত হইলেন।

কৃষ্ণ পান্তীর কথানুসারে ঐ ব্যক্তি এক দিন রাণাঘাটে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পান্তী তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি আমার বাড়ীর দেওয়ানী করিতে পারিবে?" আগন্তুক কহিলেন, "আপনকার অনুগ্রহ থাকিলে কেনই না পারিব?" ঐ ব্যক্তিই তদবধি তাঁহার বাটীর দেওয়ান হইলেন। ইনি তখন, একটী দোকানে ৪৲ টাকা বেতনে, খাতার মোহরের ছিলেন। ইহাঁরই নাম দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিই রাণাঘাট অঞ্চলে "দেওয়ান বাঁড়ুয্যে" বলিয়া বিখ্যাত। ইনি, অতি যোগ্য লোক ছিলেন; রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের সেরেস্তার হিসাব ও জমীদারী সম্পর্কে যে প্রণালীর কাগজ অদ্যাপি প্রচলিত আছে, দেওয়ান বাঁড়ুয্যেই তাহার প্রবর্ত্তক। ইনি উন্নতাবস্থায়, যার পর নাই গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম আন্দিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস ঐ বৈদ্যপুরেই ছিল। এই আন্দিরামই কৃষ্ণ পান্তীর প্রথমাবস্থার সহচর ও সমব্যবসায়ী ছিলেন। আন্দিরামের সহিত পূর্ব্ব প্রণয় স্মরণ করিয়াই, রামচাঁদের ভাল করিয়াছিলেন; নতুবা সামান্য একটী অঙ্ক কষা দেখিয়াই যে কৃষ্ণ পান্তী তাঁহাকে দেওয়ানী দিয়াছিলেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না।

কৃষ্ণ পান্তী, মুখে যাহা বলিতেন, কাযেও তাহাই করিতেন, কখন আপন কথার অন্যথা করিতেন না। এই বিষয়ে তাঁহার এমন সুখ্যাতি ছিল যে, চোর ডাকাইতরাও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে ভয় পাইত না। তিনি এক দিন, কলিকাতা হইতে নৌকা যোগে রাণাঘাট যাইতেছিলেন। পথে কতকগুলা ডাকাইত, তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তন্মধ্যে কয়েক জন আসিয়া নৌকার উপর উঠিয়া লুঠ দরাজ ও মারপিট আরম্ভ করাতে, তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার গদিতে যাইও, খুসীকরিব,—এখন চলিয়া যাও।" তাহারা কর্ত্তা বাবুর কথা শুনিয়াই চলিয়া গেল। পরে তাহারা বাসাবাড়ীতে আসিলে, তিনি বিপন্নাবস্থায় তাহাদিগকে যত টাকা দিবার মনন করিয়াছিলেন—দিয়া বিদায় করিলেন!

এক দিন, এক খানি তালুক কিনিয়া দিবেন বলিয়া, কোন ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উপযুক্ত সময় পাইয়া সেই অঙ্গীকার পালনে উদ্যত হইলে, তাঁহার পুত্রেরা "এ তালুকে অনেক লাভ আছে, ইহা পরকে দেওয়া উচিত নয়" বলিয়া আপত্তি করিলেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত ভাবে "আমি যে তাঁহাকে দিব বলিয়াছি" পুত্রগণকে এই কথা বলিয়া, আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ, বীরনগরের বামনদাস বাবুর পিতামহ মহাদেব মুখোপাধ্যায়।

তাঁহার সত্যবাদিতা বিষয়ে আরও কিম্বদন্তী আছে। এক দিন, এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট অনেক লবণ লইবে বলিয়া কিছু বায়না দিয়া যায়। কিন্তু টাকার সঙ্গতি করিতে না পারাতে, সে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বা বায়নার টাকার দাওয়া করে নাই। কিছুদিন পরেই লবণের দর অত্যন্ত চড়িয়া উঠিল। তাহাতে কৃষ্ণ পান্তী সমুদায় লবণ বিক্রয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যত লবণ খরিদ করিবে বলিয়া বায়না দিয়াছিল, সেই লবণের মুনফা তাহার নামে জমা রাখেন এবং অনেক দিন পরে তাহার দেখা পাইয়া ঐ মুনফার টাকা তাহাকে দেন।

১২১২ সালে (১৮০৫ খৃঃ) মধ্যম ঠাকুর অর্থাৎ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মধ্যম পুত্র শম্ভুচন্দ্র রায়ের মসোহারা লইয়া, নদীয়া-রাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সহিত এক মোকদ্দমা হয়। টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, শম্ভুচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রস্তাব করেন যে আপনি আপাততঃ কিছু টাকা দিন, মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর দায়ী না হন, টাকা ফেরত লইবেন। ঈশ্বরচন্দ্র চক্ষু লজ্জায় তাহাতে সম্মত হইয়া, এক জন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোককে জামিন চাহিলেন। মধ্যম ঠাকুর দেখিলেন, নদীয়া জেলার তৎকালের প্রধান ধনী ও প্রধান সম্ভ্রান্ত কৃষ্ণচন্দ্র পাল-চৌধুরীকে সহজেই জামিন দিতে পারেন। কৃষ্ণ পান্তীর নিকট এই প্রস্তাব করায় তিনি স্বীকার করিলেন। রাজা

ক্রমে শুনিতে পাইলেন যে,পালচৌধুরী শম্ভুচন্দ্রের জামিন হইবেন। তখন পালচৌধুরী বলিলে বাঙ্গালার মধ্যে কৃষ্ণ পান্তীকেই বুঝাইত। পালচৌধুরীর মত বড় লোক আর নাই, তখনকার অনেক লোকের এইরূপ সংস্কার ছিল। রাজা নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন, তিনি মধ্যম ঠাকুরের জামিন না হন। পালচৌধুরী বলিলেন, "আমি থ্যাপ ফেলিয়াছি, এখন আর তাহা কি রূপে গ্রহণ করিব।" কৃষ্ণ পান্তীর এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, "থুথু" ফেলিয়া তাহা যেমন আর পুনর্ব্বার মুখে লওয়া যায় না; কোন কথা বলিয়া সেই কথার অন্যথা করাও সেইরূপ। ঈশ্বরচন্দ্র এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ পান্তী যখন জামানতে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরে যান, তখন তাঁহাকে অপমান করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। জজ্ সাহেব জামানতে স্বাক্ষর করিবার আদেশ করিলে, পালচৌধুরী কহিলেন,—"আমার অক্ষর ভাল হইবে না, আমার দেওয়ান স্বাক্ষর করিলেই হইবে।" দেওয়ানের স্বাক্ষরে না হওয়ায়,তাঁহাকেই স্বাক্ষর করিতে হয়। ইহাতে জজ্ সাহেব পালচৌধুরীর প্রতি এক দৃষ্টে অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন এবং উত্তমরূপে বুঝিলেন বিদ্যা, সদ্গুণ ও কার্য্যক্ষমতা এ গুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। যেহেতু যে কৃষ্ণ পালচৌধুরীর ক্ষমতায় নদীয়ার রাজশ্রী রাণাঘাটে গিয়াছে,সেই কৃষ্ণ পালচৌধুরী নাম স্বাক্ষর করিতে অপটু!

একবার, এক জন ইংরাজ মহাজন, তাঁহার নিকট অনেক আতপ চাউল লইবে কথা হয়। তখন চাউলের বাজার খুব নরম ছিল। কথা হইবার কয়েক মাস পরে, চাউলের মূল্য তিন গুণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কৃষ্ণ পান্তী, সাহেবকে ডাকিয়া তাঁহার প্রার্থিত সমস্ত চাউল, পূর্ব্ব দরে দিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ পান্তীর গোলা হইতে জাহাজে চাউল উঠিতে লাগিল। কতক উঠিয়া গিয়াছে, এমন সময়, সাহেব আপনার লোকজনদিগকে এই বলিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন যে,—"এমন লোকের জিনিস আর তুলিস না ; জাহাজ ডুবে যাবে।"

তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। বালক কালে, যখন ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লইয়া গাংনাপুরের হাটে যাইতেন, তখন সেখানকার কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ স্নেহ করিতেন ; কখন কখন বাড়ী লইয়া গিয়া মুড়ির মোওয়া, জল দেওয়া ভাত প্রভৃতি, আপনার যেমন সঙ্গতি, তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। তাঁহারাও, হাটের পরিশ্রমে কাতর ও ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় তাদৃশ আহার পাইয়া চরিতার্থ হইয়া যাইতেন। কৃষ্ণ পান্তী, বহুকাল পরে কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী হইয়া, একদা নিজ বাটীতে বসিয়া আছেন, সম্মুখে একটী ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণকে বিপদ্‌গ্রস্ত বোধ হওয়ায়, নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণের মুখে শুনিলেন, তাঁহার

কতকগুলি ব্রহ্মোত্তর জমী তাঁহার সরকারে ক্রোক হইয়াছে। কৃষ্ণ পান্তী, ব্রাহ্মণের নাম, পিতার নাম, নিবাস প্রভৃতি অবগত হইয়াই গাত্রোত্থান করিলেন। এবং "মোর সঙ্গে এস" বলিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সদর কাছারীতে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তা স্বয়ং আসিতেছেন দেখিয়া, সকলে তটস্থ হইল এবং শম্ভূচন্দ্র প্রভৃতি হাতের কায ফেলিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণ পান্তী অশ্রুপূর্ণ লোচনে ;—"বলি শোম্বো ! সেই পান্তাভাত—সেই আমানী একেবারে ভুলে গিইচিস্‌ ? ধিক তোরে !" এইমত্র বলিয়া প্রত্যাগত হইলেন। শম্ভুচন্দ্র এখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, দুরবস্থার সময়, যে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে পান্তাভাত খাইতেন, এব্যক্তি সেই ব্রাহ্মণের পুত্র। তৎক্ষণাৎ অমনি ব্রাহ্মণের জমী খালাসের ছাড় প্রদত্ত হইল।

নিতান্ত গরিব থাকিয়া, পরে বড় মানুষ হইলে, অনেকে অহঙ্কারী হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণ পান্তী, যিনি এক সময়ে পান বেচিয়া কোনরূপে দিনপাত করিতেন, তিনি একণে টাকার পর্ব্বতে বসিয়াও সেই পূর্ব্ব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সামান্য কাপড় পরিতেন, সামান্য বিছানায় বসিতেন, সামান্যরূপ আহার করিতেন, জিনিসের নমুনা কাপড়ে বাঁধিয়া হাট বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আপনার আবশ্যক কার্য্য আপনিই করিতেন—

দাস দাসীর অপেক্ষা করিতেন না। বস্তুতঃ তিনি কার্য্যে অসমর্থ হইবার আশঙ্কায় বাবু হয়েন নাই। তিনি এক দিন, স্বয়ং গাড়ু হাতে করিয়া বাহিরে যাইতেছেন দেখিয়া, শম্ভুচন্দ্র বাবু গাড়ু ধরিবার জন্য খানসামা, আরদালী, বরকন্দাজ প্রভৃতি পাঠাইয়া দেন। তাহাতে তিনি শম্ভুর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন।

তিনি যে, সামান্য ভাবে থাকিতেন তাহার আরও একটী গল্প না করিয়া থাকা গেল না। তাঁহার নাম-সম্ভ্রমের অনুরূপ শরীর ও শ্রী ছিল না। দেখিতে অতি কুৎসিত ছিলেন; দেখিলে কৃষ্ণ পান্তী বলিয়া চিনিতে পারা যায় এরূপ কোন লক্ষণই ছিল না। তিনি লম্বা, একহারা ও কাল ছিলেন; ছোট কাপড় পরিতেন এবং গলায় দানা ব্যবহার করিতেন। এক দিন, এই বেশে হাটখোলায় গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিলেন নিকটে বহুসংখ্যক কিস্তী লাগিয়াছে, মহাজন ও মাজিরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছে। তিনি এক জন মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জিনিস? দর কি?" মহাজন কৌতুক করিয়া যত জিনিস ছিল, অনেক কমাইয়া বলিল, এবং যাহার ৫৲ টাকা দর, ২৲ টাকা বলিল। কৃষ্ণ পান্তী তৎক্ষণাৎ বায়না দিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। মহাজন বায়নার টাকা হাতে করিয়া লইয়াছিল। যখন শুনিল যে, যাঁহার হস্ত হইতে বায়না লইয়াছে, তিনি

হাটখোলার কর্ত্তা বাবু ; তখন কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল ও মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরে সকলে যুটিয়া গদিতে গেল, এবং অনেক কাঁদা কাঁদি ও বিনয় করিয়া বায়নার টাকা ফিরিয়া দিল।

তিনি কখন মিথ্যা কহিতেন না এবং আপন ধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি করিতেন। এক সময়ে, কোন ব্যক্তি টাকা পাইবে বলিয়া, কাহার নামে আদালতে নালিস করিয়া, তাঁহাকে সাক্ষী মানিয়াছিল। হলফ করিয়া সত্যই বল আর মিথ্যাই বল উভয়ই হিন্দু-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ এই সংস্কার থাকায়, তিনি বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ফরীয়াদী টাকা পাইবেন সত্য, আমি সেই টাকা দিতেছি, হলফ করিতে পারিব না।" ইহাতে বিচারকর্ত্তারা বিস্মিত হইয়া, সেই অবধি প্রচার করিয়া দিলেন যে, অতঃপর আর কেহ কৃষ্ণ পান্তীকে সাক্ষী মানিতে পাইবে না।

তিনি সকল কার্য্যেরই আর্থিক লাভ অনুসন্ধান করিতেন। এক দিন, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন নামক কোন সংস্কৃত অধ্যাপককে কহিয়াছিলেন, "পড়ানতে বছরে তোমার কত মুনফা হয়?" তাহাতে সেই অধ্যাপক আপন ব্যবসায়ে অধিক লাভ নাই বলিয়া দুঃখ করাতে কহিলেন, "তুমি এ ব্যবসায় ছাড়িয়া দেও, আমি টাকা দেই অন্য কারবার কর, বেশ লাভ হইবে।"

এক বার তিনি পূজার সময়ে, যে দিন আসিবার কথা সে দিন না আসিয়া, পর দিন বাড়ী আসিলেন। বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিলেন, "লাক্ টাকা রোজগার করে থুয়ে এলাম।"

ক্ষোভের বিষয় এই, যাঁহার এত ঐশ্বর্য্য, একটি সামান্য পুষ্করিণী ব্যতীত সাধারণের উপকারের নিমিত্ত, তাঁহার স্থায়ী কীর্ত্তি আর কিছুই নাই। এই সময়ে, একবার মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি লক্ষ টাকার চাল দেন (এবং রামদুলাল সরকার নগদ লক্ষ টাকা তথায় প্রেরণ করেন); এই সাহায্যেই দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইয়া টাকা উদ্বৃত্ত হয়।

নিম্নলিখিত আখ্যায়িকার দ্বারা তাঁহার প্রথমাবস্থার আতিথেয়তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পিতার মৃত্যুর পর, এক দিন গাংনাপুরের হাটে যাইবেন বলিয়া প্রত্যুষে স্নান করিতে যাইতেছেন, পথে একটী জরতী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে,—"বাপু! কৃষ্ণ পান্তীর বাড়ী কোথায়—আমি এবেলা সেই স্থানে অবস্থিতি করিব।" ইহাতে তিনি পরম আদরে তাঁহাকে বাটী পাঠাইয়া দিয়া, সত্বর স্নান করিয়া আসিলেন। বাটী আসিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! ঠাকুরাণীকে কোথায় বসিতে দিয়াছ?" তিনি তাঁহাকে যে ঘরে বসিতে দিয়াছিলেন, নির্দ্দেশ করিয়া বলিলে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই ঘরে গিয়া দেখি-

লেন তথায় কেহই নাই,—কেবল ধুনা গুগ্‌গুলাদির গন্ধে গৃহ আমোদিত রহিয়াছে ; ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া সেই ঘরে কোনরূপ অত্যাচার না হয়, এই বিষয়ে জননীকে অনুরোধ করিয়া হাটে গেলেন। তদবধিই তাঁহার উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। যখন অতিথিকে অন্ন দিবার সঙ্গতি ছিল না, তখন তাঁহার অতিথির প্রতি ভক্তি ছিল ; উন্নতাবস্থায় তাঁহার সেই ভক্তি সমভাবে ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ; যে হেতু, রাণাঘাটের মধ্যে উক্ত বংশীয় পালচৌধুরী, যাঁহারা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কাহারও বাড়ীতে সাধারণ অতিথিসেবার বন্দোবস্ত নাই।*

আমরা শুনিতে পাই, তাঁহার জননী, ব্যবসায় করিবার জন্য প্রথমে তাঁহাকে একটী আধুলি দিয়াছিলেন। তিনি সেই আধুলিমাত্র মূল ধন লইয়া ক্রমে এত টাকা উপার্জ্জন করেন ; এই নিমিত্ত অনেকে তাঁহাকে এক আধুলির বড় মানুষ বলিয়া থাকে। কার্য্য দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তিনি খুব হিসাবী লোক ছিলেন। পাঠক, যদি সৌভাগ্য কাহাকে বলে জানিতে চাও ;—

---

* সম্প্রতি রাণাঘাটের বিখ্যাত জাতিশেরী দে চৌধুরী বাবুদিগের সহিত বিবাদ হওয়ায় পালচৌধুরী বাবুরা একটী অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছেন। ১২৮১ সাল।

যদি "ছাই মুটাটা ধরিলে সোণা মুটাটা হয়" ইহার উদাহরণ দেখিতে চাও কৃষ্ণ পান্তীকে দেখ।

এক সময়ে, তাঁহারেই বংশীয় কোন ব্যক্তি বহুসংখ্যক টাকার গুড় ক্রয় করিয়াছিলেন। ক্রয়ের অব্যবহিত পরেই গুড়ের বাজার অত্যন্ত নরম হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে তিনি যার পর নাই চিন্তিত হয়েন। এমন সময় কৃষ্ণ পান্তী সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সবিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন,—"ব্যবসারে লাভ করা তোমার কর্ম্ম নয়,—সমুদায় গুড় আমাকে কেনা দরে দেও।" তখন যেরূপ বাজার, প্রথম ব্যক্তি কেনা দরে ছাড়িতে পাইয়াই আপনাকে লাভবান্ বোধ করিলেন। কৃষ্ণ পান্তী নরম বাজারে অনেক টাকার গুড় কিনিয়া বাড়ী যাইবামাত্র কলিকাতা হইতে সম্বাদ পাইলেন যে,গুড় বিলক্ষণ মহার্ঘ হইয়াছে। সুতরাং সেই গুড় ছাড়িয়া প্রচুর লাভ করিলেন।

কৃষ্ণপান্তীর উপাখ্যান, অদ্ভুত উপন্যাসের ন্যায় অবাক্ হইয়া শুনিতে হয়। সমুদায় লিখিতে গেলে এক খান স্বতন্ত্র পুথি হইয়া উঠে। অতএব এই স্থানেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করা গেল।

যাহা হউক, তিনি বালক কাল হইতে ষাটি বর্ষ পর্য্যন্ত এইরূপে জীবনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, ১২১৬ সালে (১৮০৯ খৃঃ) পরোলোক গমন করেন। তিনি, লেখা পড়া ভাল জানিতেন না, কিন্তু মূর্খও ছিলেন না।

যাঁহারা এক্ষণে নদীয়া জেলার প্রধান জমীদার বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহারা বাবুগিরির চূড়ান্ত করিতেছেন, যাঁহাদের ঘর-দ্বার বাগ-বাগিচা দেখিলে ইন্দ্রের অমরাবতী মনে পড়ে, জাঁকজমক ও শ্রীছাঁদ দেখিয়া যাঁহাদিগকে স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়া বোধ হয়, যাঁহারা একাদিক্রমে পাঁচ পুরুষ বিশেষ যত্ন করিয়াও রাজলক্ষ্মীকে তাড়াইতে পারিতে-ছেন না, কৃষ্ণ পান্তীই রাণাঘাটের সেই পালচৌধুরী দিগের এত সমৃদ্ধির মূলাধার।

এক কালে যিনি দুই কড়ার মোওয়া পাইয়া সন্তুষ্ট হইতেন, যিনি পানের বোঝা মাথায় করিয়া হাটে হাটে বেড়াইতেন, যিনি বলদের পিঠে ছালা চাপাইয়া দেশে দেশে চাল ধান বেচিয়া বেড়াইতেন, যিনি ধুলা মাথা ছেড়া কাপড় পরিয়া দীন বেশে দিন কাটাইতেন; সেই কৃষ্ণ পান্তীর পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, উৎসাহ, বিষয়-বুদ্ধি এবং সত্যনিষ্ঠাই রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের ঈদৃশী উন্নতির নিদান।

কৃষ্ণ পান্তীর দুই স্ত্রীর গর্ভে প্রেমচাঁদ, ঈশ্বর, উমেশ ও রামরত্ন এই চারি পুত্র হয় এবং শম্ভু পান্তীর, বৈকুণ্ঠ ও কাশীনাথ এই দুই পুত্র হয়। ইহাঁদিগের মধ্যে রামরত্ন নিঃসন্তান; অবশিষ্ট পাঁচ জন হইতেই রাণাঘাটের বিখ্যাত বহুবিস্তৃত পালচৌধুরী বংশের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়।
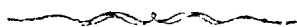
যিনি, বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া আমরা শ্লাঘা করিয়া থাকি; যিনি মানুষের হিত করিবেন বলিয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন; সংক্ষেপে সেই মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিত হইতেছে।

ইনি, ১১৮১ সালে (১৭৭৪ খৃঃ) বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর * গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা রাধানগরের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। ঐ গ্রামে ইহাঁর আদিম নিবাস নহে। রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায়, দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান রাজার উপদ্রবে, মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানে আসিবার কারণ এই;—বর্দ্ধমান জেলা অতি উত্তম স্থান এবং ঐ জেলায় রামকান্তের পৈতৃক ভূম্যাদি ছিল। মুরশিদাবাদও ইহাঁদের প্রকৃত নিবাস নহে। রামমোহন রায়ের পিতামহ নবাব সরকারে কোন প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়া মুরশিদাবাদ আসিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি ঐ চাকরী সূত্রে, পরিবারাদি লইয়া মুরশিদাবাদেই এক প্রকার বাস করিয়াছিলেন।

* এক্ষণে হুগলী জেলার অন্তর্গত হইয়াছে।

ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই রামমোহন রায়ের পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু, যে সময়ে আরঙ্গেব নামে এক জন গোঁড়া মুসলমান, দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। আবার ইহাঁরই অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রামমোহন রায় চাকরীর মুখে জলাঞ্জলি দিয়া কর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন। তাঁহার স্বলিখিত আত্মবৃত্তান্তে দেখা যায়, চাকরী ব্যবসায় তাঁহাদের বংশে ১৪০ বৎসরের অধিক প্রচলিত ছিল না।

বালকগণ, তোমরা এমন মনে করিওনা যে, সামান্য পাঠশালায় লেখা পড়া করিলে বড় লোক হইতে পারে না। আপনার শ্রম এবং যত্নই বড় হইবার প্রধান সাধন। জগদ্বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়, লেখা পড়া শিখিবার জন্য প্রথমে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। অতি পূর্ব্বকালের কথা বলিতেছি না,—রামমোহন রায়ের সময়ে গুরু মহাশয়দিগের যত বিদ্যা ছিল, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের যত্নে ছেলেদের ইষ্ট অতি অল্পই হইত। যে ছেলের কথা হইতেছে, গুরু মহাশয়ের পাঠশালাতেই তাঁহার বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হইয়াছিল। অগ্নি যেমন ঘোরতর অন্ধকার ভেদ করিয়া স্বতঃ প্রকাশ পায়, সেইরূপ তাঁহার বুদ্ধি-

জ্যোতিও, তাদৃশ কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের মধ্য হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিছু চাপা পড়িলে বাঁশের কোঁড় যেমন তাহা পাশে ফেলিয়া উঠিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ অযোগ্য শিক্ষালয়ের দোষ সকল অধঃকৃত করিয়া উন্নত হইতে লাগিলেন। তিনি পাঠশালায় থাকিয়াই বাঙ্গালা ভাষা একরূপ শিখিয়া ফেলিলেন।

এখনকার বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও অনুশীলনের সঙ্গে তুলনা করিলে, রামমোহন রায়ের সময়ে কিছুই ছিল না, বলিলে হয়। তখন সংস্কৃত ভাষাধ্যায়ী ২। ৪ জন ব্যতীত অপর কেহ বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় শুদ্ধ করিয়া বলিতে বা লিখিতে পারিত না। কিন্তু রামমোহন রায়, সেই সময়ে আপন শ্রম ও বুদ্ধিবলে, যেরূপ বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে হয়। বাঙ্গালা শিক্ষার পর, তাঁহার পিতা তাঁহাকে আরবী ও পারসী শিখাইবার জন্য পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। এখন যেমন, ইংরাজী শিখিলে বড় বড় কর্ম্ম হয় ও রাজপুরুষদিগের নিকট আদরণীয় হওয়া যায়, তখন আরবী ও পারসী জানিলেও সেইরূপ হইত। রামমোহন রায় কিছু দিন মন দিয়া এই দুই ভাষা ও উহাতে অনুবাদিত গ্রীক্‌দিগের ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ করিলেন। বিশেষতঃ ইয়ুক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব ও অরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র

পড়িয়া বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর ও সুমার্জ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি যে পথ ধরিয়া ভুবনব্যাপিনী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য জনপদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, মহম্মদের গ্রন্থই তাহার প্রবর্ত্তক, তাহার মতেই তাঁহাকে সেই পথের পথিক হইতে হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই তাঁহার পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিদ্বেষ জন্মে ও একেশ্বরে বিশ্বাস হয়।

পরে আরবী ও পারসী পড়া সমাপ্ত করিয়া, সংস্কৃত পড়িবার জন্য বারাণসী গমন করিলেন। সেখানে, বড় বড় অধ্যাপকগণের নিকট অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া, কিছু দিনের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ অধিকার হইল। বেদ পুরাণ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করাতে ক্রমে ক্রমে আপনার মত দৃঢ় হইয়া উঠিল; এবং তাঁহার মন স্বভাবতঃ যে ধর্ম্মের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, আমাদিগের প্রাচীন মুনিগণ কর্ত্তৃক বেদ পুরাণে সেই ধর্ম্মবাদ গোপন করা রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। পরে, দেশে ফিরিয়া আসিয়া ১১৯৭ সালে (১৭৯০ খৃঃ) ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" নামে এক খানি পুস্তক লিখিলেন। পৌত্তলিক ধর্ম্ম মিথ্যা; উহা অবলম্বন করিলে ভাল না হইয়া মন্দ হয়; তাহা ত্যাগ করা উচিত; ঐ গ্রন্থে এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছিল। উহা হিন্দু-সমাজে প্রচা-

রিত হইবামাত্র একেবারে চারি দিকে দ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। রামমোহন রায় তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; অম্লান-বদনে সেই অনল-তাপ সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী পিতা রামকান্ত রায়ের দ্বেষ ও অবজ্ঞায় তাঁহাকে ঘর ছাড়িতে হইয়াছিল।

প্রথমে তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে গমন করিয়া কোথায় কিরূপ ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং কি রূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে স্ব স্ব অবলম্বিত ধর্ম্মের দৃঢ়তর বিশ্বাস-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া সধর্ম্মাক্রান্ত করিবেন, তাহারই পথ দেখিতে লাগিলেন। তিনি কেবল স্বদেশের ধর্ম্মসংশোধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন এমন নহে, কিরূপে পৃথিবীর সমস্ত লোক ব্রহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বনে সমর্থ হইবে, সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতেন। ধর্ম্মসংশোধনরূপ গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে হইলে যে সকল মহৎ গুণ আবশ্যক, রামমোহন রায়ের সে সমুদাই ছিল। নানা দেশের নানা শাস্ত্রে জ্ঞান, সাহস, দয়া, শ্রমশক্তি, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল ছিলনা।

ভারতবর্ষ দেখা হইলে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম জানিবার জন্য তিব্বতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, তাহারা কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা অর্চ্চনা করে। তিনি নির্ভয়চিত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের দোষ

দেখাইতে আরম্ভ করিলেন ও তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন। সে সব বানরের প্রতি পক্ষি-উক্তির ন্যায়; সে সকল উপদেশে আপনারই অনিষ্ট ঘটিতে লাগিল। তিব্বতবাসিরা রামমোহন রায়ের কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, তাহাতে তিনি কিছু মাত্র কুণ্ঠিত বা ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি লোকের দ্বেষ, অত্যাচার ও তিরস্কারকে অঙ্গের আভরণ জ্ঞান করিতেন, লোকের ভাল করিতেছেন এই দৃঢ় নিশ্চয়ে বরং সন্তুষ্ট হইতেন। সুতরাং তিনি যে, দূরস্থিত তিব্বত দেশে থাকিয়া তাহাদিগের অত্যাচারে আপনাকে বিপদাপন্ন জ্ঞান করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি তিব্বত, যে বাড়ীতে বাস করিতেন, সেই বাড়ীর কয়েকটি স্ত্রীলোক, বরাবর তাঁহার পক্ষতাবলম্বন করিয়াছিল; তিব্বতবাসিদিগের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা সবিশেষ চেষ্টা করে। উক্ত অঙ্গনাগণ তাঁহার সৎকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া, তিনি যাবজ্জীবন স্ত্রীলোকের প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন। এই রূপে প্রায় চারি বৎসর দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

বাইশ বৎসর বয়সের সময় রাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ধর্ম্ম চিন্তায় একান্ত

আসক্ত ছিল বলিয়া, ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে অধিক সময় ও আয়াস লাগিয়াছিল। ফলে, শেষে তিনি এই ভাষা এমন উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন যে, উহাতে বড় বড় অনেক গুলি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। সাহেবেরা বাঙ্গালীর ইংরাজীকে প্রায়ই প্রশংসা করেন না, কিন্তু অনেক প্রধান প্রধান সাহেবেরা, রামমোহন রায়ের ইংরাজী-ভাষা-ব্যুৎপত্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অসাধারণ শ্রম ও অধ্যবসায় গুণে ক্রমে সংস্কৃত, আরবী, পারসী, বাঙ্গালা, হিন্দী, হিব্রু, গ্রীক্, লাটিন্, উর্দ্দু এবং ইংরাজী এই কয়েক ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আও ২। ১ টী ভাষায় কার্য্যোপযোগি জ্ঞান লাভ করিাছিলেন।

যিনি এত ন অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, ১২১০ সালে (১৮০৩খৃঃ) পিতার মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহাকে পরিবার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে হইল। তিনি পৈতৃক বিষয়ের যে তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত না, এই জন্য রঙ্গপুর জেলার কাল্কেটরীতে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কালেক্টর ডিগ্‌বী সাহেব ভদ্র ও গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া রামমোহন র অন্যান্য আমলাগণের অপেক্ষা

সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিতে পারিতেন, এবং ঐ সাহেবের সহিত প্রণয় হওয়াতে তাঁহার নিকট আরও ইংরাজী পড়িতে লাগিলেন। যাহা হউক, তখন বাঙ্গালিদিগের যাহা হইতে আর উচ্চ পদ প্রায় হইত না, রামমোহন রায় অতি শীঘ্র সেই সেরেস্তাদারী কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। এই কর্ম্মে তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; এবং কয়েক বৎসর পরে অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহাদের পুত্রাদি না থাকায় তিনিই সমস্ত পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই বিষয় হস্তগত করিতে, তাঁহাকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কারণ তাঁহার দায়াদগণ, রামমোহন রায় জাতিচ্যুত হইয়াছেন— পৈতৃক বিষয়ে তাঁহার অধিকার নাই বলিয়া আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিল। তিনি হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা আদালত ও জ্ঞাতিবর্গকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে,—তাঁহার জাতি যায় নাই। সুতরাং তখন আর তাঁহার বিষয়-প্রাপ্তির অন্য কোন প্রতিবন্ধক থাকিল না। ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার অনেক অর্থব্যয় ও অনেক সময় নষ্ট হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের হিতোদ্দেশে যে কোন কার্য্য করিতে হয়, সকল বিষয়েই প্রচুর অর্থের আবশ্যকতা আছে। এই নিমিত্তই তিনি পৈতৃক বিষয় লাভে এত যত্ন করিয়াছিলেন।

এইরূপে বিপুল বিভব হস্তগত হওয়াতে, তিনি চাকরী ছাড়িয়া পুনরায় মুরশিবাবাদে গমন করিলেন এবং তথায় থাকিয়া "পৌত্তলিকতা সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধ" এই নাম দিয়া পারসী ভাষায় এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। পরে ১২২১ সালে (১৮১৪ খৃঃ) কলিকাতায় আগমন করিলেন। নগরের কোলাহল ও বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া, নির্জ্জনে অবস্থিতি পূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার যে বাসনা চিরকাল তাঁহার অন্তঃকরণে বলবতী ছিল, এক্ষণে সেই বাসনা পূর্ণ করিলেন। কলিকাতার পূর্ব্ব অংশে সারকুলার রোডে একটী অতি সুন্দর বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন, এই বাটীর চারি দিকে ফুলের বাগান ছিল;—এই সময়ে তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর।

মহাত্মা রামমোহন রায়, এই সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কেবল ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যতগুলি ভাষা শিখিয়াছিলেন, প্রায় সকল ভাষাতেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া সমস্ত লোককে বিতরণ করিতে লাগিলেন। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক (বাইবেল) হইতে সুনীতি সকল বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যেরূপ অর্থ ব্যয়, পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে।

"পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর জীবন" এই কথার মাহাত্ম্য কেবল তিনিই বুঝিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ক্ষমতা, অর্থ ও জীবন পরোপকার-রূপ মহাব্রতেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান কি মুসলমান সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। কিন্তু, শৈল যেমন সহস্র সহস্র তরঙ্গ আঘাতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হয় না, তাঁহার একাগ্র অন্তঃকরণও সেইরূপ মহৎ বিশ্বাস হইতে কিছুতেই বিচলিত হইল না; তিনি ভয়শূন্য অনন্য চিত্তে কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অনেক দিন গত হইলে, তাঁহার বহুযত্ন প্রতিপালিতা আশালতার ফল জন্মিল। অনেক গুলি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক তাঁহার দিকে আসিয়া, কিরূপে অপর সাধারণে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রশস্ত পথে আগমন করিবে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়, ইহাঁদিগকে লইয়া ১২৩৪ সালে (১৮২৭খৃঃ) কলিকাতার কমল বাবুর বাড়ীতে একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। এই সময়ে, চারি পাঁচ জনের অধিক সমাজের সভ্য ছিল না; এবং রামমোহন রায়কে প্রাণের ভয়ে, সঙ্গে অস্ত্র রাখিতে হইত। যাহা হউক, ঐ সমাজই অদ্যাপি কলিকাতায় বিদ্যমান থাকিয়া, তাঁহার মহামহিম নামকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত

লোকের স্মরণ-পথে আনয়ন করিতেছে। এই সভা প্রতি বুধবারে বসিয়া থাকে। উপাসকেরা, প্রথমে পর-ব্রহ্মের উপাসনা করেন,—পরে সমাজের ও প্রত্যেক ব্যক্তির হিতকর নানাবিধ নীতিবিষয়ক প্রস্তাব পাঠ ও শেষে রামমোহন রায়ের কৃত উত্তমোত্তম ব্রহ্মসংগীত করিয়া সভা ভঙ্গ হয়। জনসমাজে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও নানাবিধ বিদ্যা-বিষয়ক উপদেশ প্রচার করিবার জন্য, এই সভা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বহুল পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সভায় আসিয়া যে সে ব্যক্তি উপাসনা করিতে ও উপদেশ শুনিতে পারে, কাহার বারণ নাই।

এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে দেশ-প্রচলিত হিন্দু প্রথা উঠিয়া গেল। ব্রাহ্মণ শূদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই এক পথে দাঁড়াইয়া জগৎপিতাকে ডাকিতে লাগিলেন দেখিয়া, দেশের কতকগুলি প্রসিদ্ধ হিন্দু, ক্রোধে অন্ধ হইয়া দ্বেষে জ্বলিতে লাগিলেন। যাহাতে ব্রাহ্মগণ অপদস্থ হয়—ব্রাহ্ম সভা উঠিয়া যায়—ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বৈব মিথ্যা ও একাকারের মূল বলিয়া সকলে জানিতে পারে, এই উদ্দেশে তাঁহারা "ধর্ম্ম সভা" নামে অপর একটী সভা সংস্থাপন করিলেন। এই দুই দলে, কিছু দিন ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে উভয় পক্ষই এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, কোন্ পক্ষে জিত

হইবে, তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত সহজে বুঝিতে পারা যায় নাই। শেষে ব্রাহ্ম সভারই জয় লাভ হইল।

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এদেশে সতীদাহের ভয়ানক প্রথা প্রবল ছিল। শত শত হিন্দুকামিনী মৃত পতির জ্বলচ্চিতায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিত। "সহগমন করিলে সতীর অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, এবং ঐ পতির সঙ্গে স্বর্গ রাজ্যে নিত্য সুখভোগ হয়" দেশীয় লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সকল স্ত্রীই যে, ঐ বিশ্বাসের বশে সহগামিনী হইত, এমত বলা যাইতে পারে না। যাহারা পতি-প্রতিকূলা ও দুঃশীলা, তাহারাও পুরাতন কলঙ্ক-নাশ ও সতী বলিয়া খ্যাতিলাভের নিমিত্ত পতির চিতারোহণ করিত। শুনা যায় যে, যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া পাছে জ্বলন্ত চিতা হইতে পলায়ন করে এই আশঙ্কায়, সহগামিনী স্ত্রীর আত্মীয়বর্গ তাহাকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিত,—তাহার আর্ত্তনাদ ঢাকিবার নিমিত্ত ঢাকিরা চতুর্দ্দিকে মহাশব্দে ঢাক বাজাইত—দর্শনকারিরা মাঝে মাঝে জাঁকাইয়া হরিবোল দিত।

রামমোহন রায়, হিন্দু সমাজের এই বিষম অনিষ্টকর নৃশংস প্রথা এককালে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহমরণে স্ত্রীগণের ধর্ম্ম নাই,—প্রধান প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার বিধি নাই,—

ইহা সম্পূর্ণ অধর্ম্ম এবং যুক্তিবিরুদ্ধ ; এই বলিয়া বিবিধ প্রামাণিক ও যুক্তিযুক্ত গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গবর্ণর-জেনেরেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতেই সহগমন উঠাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কল্পনা হইতেছিল। সহগমন নিবারণ করিলে পাছে হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয়, এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে রামমোহন রায়ের লিখিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর নির্ভয়ে সহগমন প্রথা উঠাইয়া দিলেন। অতএব মহামহোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের যত্নই এই কদর্য্য প্রথা নিবারণের প্রধান কারণ বলিতে হইবে। এই শুভ কর্ম্ম ১২৩৬ সালে (১৮২৯ খৃঃ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বরে) সম্পন্ন হয়। ইহার পর এপর্য্যন্ত, বঙ্গদেশে এ দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে নাই ; কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে দুই একটী স্ত্রী অদ্যাপি ঐ রূপে সহমৃতা হইয়া থাকে।

যে সময়ে সহগমন উঠাইবার জন্য রাজনিয়ম প্রচারিত হইল, সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসভা, একবার কোলাহল করিয়া উঠেন। তাঁহারা নিজে এবং আর কতকগুলি প্রাচীন হিন্দুর স্বাক্ষর করাইয়া, যাহাতে সহগমন প্রথা রহিত না হয়, এই অভিপ্রায়ে এক আপত্তি পত্র লিখিয়া, বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে, রামমোহন রায়ও, দ্বারকানাথ ঠাকুর,

কালীনাথ রায় প্রভৃতি কতিপয় বড় বড় লোকের স্বাক্ষর করাইয়া, বেণ্টিঙ্ক মহোদয়কে দেশের পরম উপকারী বলিয়া, এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলেন। ধর্ম্ম-সভার প্রতিবাদ পত্র অগ্রাহ্য হইল। এই সময় হইতেই ধর্ম্ম-সভার সভ্যগণ একে একে গা ঢাকা হইলেন। এক্ষণে কখন কখন সেই সভার নামমাত্র শুনা যায়। সম্প্রতি তাহা "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভারূপে পরিণত হইয়াছে।

বিদ্যা, ধন, সভ্যতা ও রাজনীতি বিষয়ে যে স্থান পৃথিবীর মধ্যে প্রধান হইয়াছে, রাজা রামমোহন রায় অনেক দিন হইতে সেই বিলাত গমনে অভিলাষী ছিলেন। এক্ষণে সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। এ দিকে, রামমোহন রায় বিলাত গমন করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছেন শুনিয়া, দেশীয় লোকেরা একেবারে চারি দিক্ হইতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায়, কখনই সাধারণ মতে উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই; সহিষ্ণু ও অবিরক্তচিত্তে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ দূরীকরণে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। তখনও "পোতারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র বা বিদেশ গমনে জাতি যায় না" ইহা পরম যত্নে সাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন। কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়ে উপেক্ষা করিয়া, তাহাদিগের সংস্রব ত্যাগ করাকে, তিনি সাহস ও পৌরুষ মনে করি-

তেন না; তাঁহার বোধ ছিল, দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকের চরিত্র সংশোধন করাই সৎসাহস ও মনুষ্যত্বের লক্ষণ। তিনি আরও ভাবিতেন যে,সাধারণকে পরিত্যাগ করিয়া যত দূরে যাইবেন, অভীষ্ট সাধনে ততই অকৃত-কার্য্য হইবেন। হিন্দু-সমাজ সংশোধন বিষয়ে, তিনি এই এক প্রধান যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন যে,সাধা-রণ মতের সহিত যে পরিমাণে আপন মতের একতা স্থাপন করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণেই কার্য্যকারী হইবে। রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত্রের এই অংশে সমাজত্যাগেচ্ছু ব্রাহ্মগণের বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক। যাহা হউক, তিনি সাধারণকে একরূপ সম্মত করিয়াই সমুদ্র গমনে কৃতসংকল্প হইলেন।

এই মহত্তর মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অধিক ভাবিতে ও কষ্ট পাইতে হয় নাই। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যেমন পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, সুযোগও তেমনি অতর্কিত ভাবে সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। তিনি ইংলণ্ডবাসিদিগের চরিত্র, রীতি, সভ্যতা, ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন, এবং সেই স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিবেন, ইহাই তাঁহার ইংলণ্ড গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে, ইংলণ্ডে রাজকীয় প্রধান সমাজে (বোর্ড অব কণ্ট্রোলে) বিশেষ কোন প্রার্থনা জানাইবার প্রয়োজন হওয়াতে,

ইংলণ্ডে পাঠাইবার জন্য দিল্লীর সম্রাট্ এক জন উপযুক্ত দূত অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সে সময়ে, রামমোহন রায়ই সর্ব্ব বিষয়ে সুযোগ্য ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকেই মনোনীত করিয়া রাজা উপাধি প্রদান পূর্ব্বক পরম যত্নে বিলাতে পাঠাইলেন। তদনুসারে তিনি ১২৩৭ সালে (১৮৩০ খৃঃ) ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

সমুদ্রে যখন বাতাস প্রবল হইয়া ঝটিকা উত্থিত হইত, ও পর্ব্বতাকার তরঙ্গমালায় জাহাজ আন্দোলিত করিত, তখন জাহাজের অন্যান্য লোকেরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিত; তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, পোতের উপরিভাগে বসিয়া লহরীলীলা অবলোকন করিতেন, মনে মনে প্রীতি পাইতেন এবং সেই ভয়ার্ত্ত ব্যক্তিগণকে প্রবোধ দিতেন। এইরূপে প্রায় ছয় মাসে, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন।

এই স্থানে অনেক বড় বড় লোকের সহিত আলাপ হইল এবং যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পাইলেন। ইংরাজেরা বুদ্ধি-বিদ্যা ও ক্ষমতাবলে আপনাদিগের দেশকে যেরূপ রমণীয় করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি লণ্ডন, লিবারপুল, মাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে তন্ন তন্ন করিয়া ভ্রমণ করিলেন। সেখানকার অদ্ভুত শিল্প, সুন্দর

অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ, রমণীয় উদ্যান, পরম শোভাকর অত্যুন্নত কীর্ত্তিস্তম্ভ, পথিক পূর্ণ পান্থশালা, অনাথনিবাস, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ভজনালয়, রাজসভা প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী, ধর্ম্মচর্চ্চা এবং আচার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময় সহকৃত আনন্দরসে অভিষিক্ত হইলেন।

এই সময়ে, ভারতবর্ষীয় ইংরাজ কোম্পানি ইজারার মেয়াদ বাড়াইয়া লইবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করেন। কোম্পানি কিরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, ইহা ইংলণ্ডেশ্বরকে জানাইবার জন্য এখানকার সমস্ত রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। সেই সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের সাক্ষ্যও গৃহীত হয়। তিনি বিদ্বান্, রাজনীতিজ্ঞ ও ভারতবর্ষে ইংরাজ কোম্পানির শাসনপ্রণালীর বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহার সাক্ষ্য অপেক্ষাকৃত আদরণীয় ও কার্য্যকারী হইয়াছিল। ইহা তাঁহার সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

ইংরাজদিগের শাসন প্রণালীতে যে সকল দোষ ছিল, নির্ভয়-চিত্তে প্রকাশ করিলেন এবং কি উপায়ে সেই সকল দোষের সংশোধন হইতে পারে তাহাও সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন।

তিনি ১২৩৯ সালে (১৮৩২ খৃঃ) ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স যাত্রা করেন। তখন লুইস্ ফিলিপ্ সেখানকার রাজা ছিলেন। তিনি, রাজা রামমোহন রায়কে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন এবং কয়েক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। রামমোহন রায় ফ্রান্স গমন করিবার পূর্ব্বে ফরাসী ভাষা উত্তমরূপ জানিতেন না, সুতরাং ফ্রান্সের রাজনীতি বুঝিতে এবং তত্রত্য প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিতে তাঁহার কিছু কষ্ট হইয়াছিল। এই জন্য তিনি ফ্রান্সে এক বৎসর ছিলেন। প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই সময়ের মধ্যেই উক্ত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ভারতবর্ষে থাকিয়াই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য জনপদের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন, চাক্ষুস আলাপ মাত্র বাকী ছিল; সুতরাং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যেখানে যেখানে গমন করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রেই পরম সমাদরে পরিগৃহীত হন। এক বৎসর পরেই ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ড প্রত্যাগমন করেন।

ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হওয়ার পর, ১২৪০ সালে (১৮৩৩খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে) তিনি ব্রিষ্টলের নিকটবর্ত্তী ষ্টেপেল্টন্ গ্রোভ নামক স্থানে গমন করেন। উঁহার কলিকাতাস্থিত বন্ধু হিন্দুকালেজসংস্থাপক ডেবিড্ হেয়ারের কন্যা কুমারী হেয়ার, তাঁহাকে ঐ স্থানে লইয়া যান। রাজা রামমোহন রায় কয়েক জন

অনুরাগী মিত্রের সহিত তাঁহার ভবনে কিছু দিন পরম সুখে অতিবাহিত করিয়া ২৫এ সেপ্টেম্বরে পীড়িত হন। ক্রমাগত ৩ দিবস পীড়া ভোগ করিয়া ২৭এ সেপ্‌-টেম্বর অপরাহ্ন ২টা ২৫মিনিটের সময় কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব আদেশ অনুসারে মৃত্যুর প্রায় ২০ দিবস পরে, ষ্টেপেল্‌টন্‌ গ্রোভের এক রমণীয় স্থানে তাঁহার শব স্বতন্ত্রভাবে সমাহিত হয়। বিদেশে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় স্বদেশীয় মিত্রগণের মধ্যে অনেকে ক্ষুব্ধ আছেন; কিন্তু যাঁহারা কুমারী কার্পেণ্টারের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ক্ষোভের বিষয় কিছুই নাই। ইংলণ্ড সদৃশ স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পীড়িত হইলে তাঁহাদের চিকিৎসাদি যেরূপ হওয়া সম্ভব, রাজা রাম-মোহন রায়ের তদপেক্ষা কম হয় নাই।

কলিকাতা নিবাসী গুণগ্রাহী দ্বারকানাথ ঠাকুর, ১২৫০ সালে (১৮৪৩খৃঃ) ইংলণ্ডে গমন করিয়া মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাধি দর্শন করেন। তিনি দেখিলেন ষ্টেপেল্‌টন্‌ গ্রোভ স্থিত সমাধি কোন ক্রমেই তাঁহার মহামহিম নামের যোগ্য নহে; তাঁহার স্মরণের জন্য সেই সমাধির উপর কিছুই নাই। এই নিমিত্ত, তিনি উক্ত বর্ষের ২৯এ মে রামমোহন রায়ের শব সেই স্থান হইতে উত্তোলন করিয়া ইয়ারনোজ ভেল নামক স্থানে সমাহিত করেন এবং ঐ সমাধির উপর এক পরম সুন্দর স্মরণ-

স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উহা অদ্যাপি সৌন্দর্য্যের সহিত বিদ্যমান আছে; ভারতবর্ষের অনেকে উহা দেখিয়া আসিয়াছেন।

তিনি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর পর, তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এই বিষয়ে নানা জাতিতে নানা গোল তুলিয়াছিল। তাঁহাকে, মুসলমানেরা মুসলমান, খৃষ্টানেরা খৃষ্টান এবং বৈদান্তিকেরা বৈদান্তিক কহিত। কিন্তু তিনি এ তিনের কোন মতাবলম্বীই ছিলেন না। তবে কোরাণ, বাইবল্, বেদ, বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতি যে কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রে যথার্থ তত্ত্ববিষয়ক বাক্য দেখিতেন, তাহা অতি আদরপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার যেরূপ মত ছিল, বিস্তারপূর্ব্বক লিখিলে বালকগণের বোধগম্য হইবে না; এই নিমিত্ত নিম্নে কয়েকটী মাত্র স্থূল স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।

তিনি বলিতেন, মানুষ কখন ভ্রমশূন্য হইতে পারে না। সুতরাং মনুষ্য প্রণীত শাস্ত্রও ভ্রমশূন্য নয়। পরমেশ্বরের কত শক্তি, কত দয়া, কত ক্ষমতা, কেমন আকার, কি অভিপ্রায়, তাহা সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হওয়া দূরে থাকুক—কল্পিত হইতেও পারে না। সংসার ও আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া বনবাস আশ্রয় করা—ধর্ম্ম নয়; পার্থিব বস্তুদ্বারা পুরাণ-কল্পিত প্রতিমা নির্ম্মাণ

করিয়া পূজা করা—ধর্ম্ম নয়; দর্শন শাস্ত্র পড়িয়া পরমেশ্বর নিরূপণ করিতেছি বলিয়া তর্ক-বিতর্ক করা—ধর্ম্ম নয়; ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বরের অনুগৃহীত বলিয়া পূজা ও বিশ্বাস করা—ধর্ম্ম নয়; জল-বায়ু-অগ্নি-সূর্য্যকে পরমেশ্বর জ্ঞান করা—ধর্ম্ম নয়; ছাপা গায় দিয়া করতালী, চীৎকার ও মৃদঙ্গাদির বাদ্যোদ্যমে নিশার নিস্তব্ধতা নষ্ট করা—ধর্ম্ম নয়। যে আদি পুরুষ সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন সেই নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, মঙ্গলময়, স্বতন্ত্র, নিরাকার, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব নিয়ন্তা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, ধ্রুব ও পূর্ণ পুরুষের উপাসনাদ্বারাই লোকের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। তাঁহাতে প্রীতিস্থাপন ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। ইহার অনুষ্ঠান ও প্রচারে প্রাণপণে যত্ন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার এই যত্ন অনেক অংশে সফল হইয়াছে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যেরূপ লোক ছিলেন সাধারণসমক্ষে তদনুরূপ পরিচয় দিতে পারিলাম না। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র-চরিত এতাদৃশ সংক্ষেপে বর্ণন করায়, হয় ত তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইল। বোধ হয়, গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে তাহা ধর্ত্তব্য হইবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, যিনি আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এতাদৃশী মহতী উন্নতি লাভ করিয়া

গিয়াছেন; আমরা সেই স্বদেশীয় মহাপুরুষকে চিনিতে পারি নাই এবং তাঁহার গুণগ্রামের উপযুক্ত পুরস্কার দেই নাই; বরং স্বদেশীয় অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধবাদি। তাঁহারা, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার-কে স্বদেশের উপকার মনে করেন না। তাঁহাদিগের অন্ততঃ ইহাও স্মরণ করা উচিত যে য়ুরোপীয় অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছিল, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্মুখে উপস্থিত না হইলে, অনেক হিন্দুসন্তান খৃস্টান হইয়া যাইতেন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে খৃষ্টধর্ম্মের সদৃশ অথবা তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে করেন, তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে প্রীত হইবেন! যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্মের অবস্থান্তর বিবেচনা করেন, রামমোহন রায়ের নিকট তাঁহাদের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য।

তিনি স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে অধিক সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইয়ুরোপীয় লোকেরা তাঁহার গুণের যথার্থ গৌরব করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুসময়ে সহস্র সহস্র ইয়ুরোপীয় স্ত্রীপুরুষ মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়াছেন। যীশু খৃষ্টের প্রতি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা, রামমোহন রায়ের প্রতিও ইয়ুরোপীয় অনেক লোকের প্রায় সেইরূপ ভাব ছিল। মনের মধ্যে কুচিন্তার উদয় হইলে তিনি উপাসনা করেন, এই কথা শুনিয়া একটী স্ত্রীলোক বিস্মিত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিল "আপনকার মনেও কি কুচিন্তার উদয় হয়?" এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহন রায় স্থান বিশেষের বড় লোক নহেন,—তিনি পৃথিবীর মধ্যে বড় লোক ছিলেন। তিনি রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি উভয় বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। বিবিধ ভাষায় ও বিবিধ বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরাজী ভাষায় অধিকার দেখিয়া ইয়ুরোপীয়েরা প্রশংসা করিতেন। পারসী ভাষা এত শিখিয়াছিলেন যে, মৌলবী রামমোহন রায় বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। সংস্কৃত ভাষায় এমন পুস্তক প্রায়ই ছিল না, তিনি যাহার সমালোচন করেন নাই। স্বদেশীয় দর্শন ও মনোবিজ্ঞান, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার্থি-বিদেশীয়-দিগের মহৎ উপকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, রামমোহন রায়ের সদৃশ ব্যক্তি পৃথিবীতে কদাচিৎ জন্ম গ্রহণ করেন।

পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়।

আমি এখন সংক্ষেপে যাঁহার জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তিনি এক জন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। যদিও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন না, তথাপি যে সকল গুণ থাকিলে মানুষের চরিত আদর্শস্বরূপে সাধারণকে উপহার দেওয়া যায়, তাঁহার সেই সকল গুণের প্রায় একটীরও অপ্রতুল ছিল না। এই প্রস্তাবের শিরোদেশে তাঁহারই নাম লিখিত হইয়াছে।

তিনি, ১১৮৫ সালে (১৭৭৮খৃঃ) হাবড়ার অন্তঃপাতী বালী গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গোকুলচন্দ্র এক জন কুলীন ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কলিকাতায় চাকরী করিয়া মাসে তিন চারি শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং পরিবার পোষণের ক্লেশ ছিল না। পদ্মলোচন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

তিনি, পাঁচ বৎসর বয়সের সময় গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে যান। কিছু দিন পরে, পিতা তাঁহাকে জানবাজারের "ফ্রী স্কুল" নামক ইংরাজী

বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দেন। "বহুবাজারের পাকড়াশীরা তাঁহার মাতামহ বংশ।" তিনি মামার বাড়ী থাকিয়া উত্তমরূপে ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন।

তিনি, যে স্কুলে পড়িতেন, সে স্কুলের ছাত্র প্রায় সমুদায়ই ইংরাজ ও ফিরিঙ্গীর সন্তান। তাহাদের অধিকাংশ পদ্মলোচনের সদ্‌গুণে বশীভূত হইল। তাঁহার সহিত প্রণয় হওয়াতে তাহারা আপনাদিগকে সুখী বোধ করিতে লাগিল। পদ্মলোচনও তাহাদের ও অন্যান্য সাহেবদের সহবাসেই অবকাশ কাল কাটাইতেন। সর্ব্বদা ইংরাজের সহিত কথাবার্ত্তা কহাতে, তিনি সুন্দররূপে ইংরাজী কহিতে শিখিলেন। ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, ইংরাজদিগের সাহস, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল অভ্যাস করিলেন। কিন্তু এখনকার অনেকে যেমন, সাহেবের সঙ্গে মিশিলেই ধুতি ছাড়িয়া পেণ্টুলন পরেন, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন, এবং সুরাসক্ত হন; সেরূপ তাঁহার কিছুই হইল না—তিনি তাহাদের একটী দোষও স্পর্শ করিলেন না।

যে সময়ে,—এদেশে লেখা পড়ার রীতিমত আলোচনা ছিল না—প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে পল্লীগ্রামে এরূপ শিক্ষা স্থান ছিল না,—ব্রাহ্মণপণ্ডিতের টোল ও গুরু মহাশয়ের পাঠশালা ব্যতীত বিদ্যাশিক্ষার উপায়ান্তর ছিল না; তখন কেহ সামান্যরূপ কিছু লেখা পড়া

শিখিলেই সকলে তাঁহাকে বিদ্বান্ বলিয়া আদর করিত। যে পদ্ম বাবু সেই সময়ে ইংরাজী ভাষায় বাস্তবিক সুশিক্ষিত হন, তিনি যে বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত এবং দেশীয় লোকের ভূয়সী প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

অল্প দিনেই স্কুলের পড়া ছাড়িয়া কলিকাতার কোন সওদাগরের বাড়ী চাকরী করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার কিছু দিনের মধ্যেই উহা ছাড়িয়া দিয়া কোম্পানির কোন অফিসে কর্ম্ম করিতে গেলেন। রেবিনিউ একাউণ্টাণ্ট * আফিসে প্রথমে ১৫ ৲ টাকা বেতনে এক কেরানিগিরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। সদ্গুণের পুরস্কার হইবেই হইবে। তিনি বিলক্ষণ নিপুণতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন; সকলের সহিত সরল ও উদার ব্যবহার করিতে লাগিলেন; প্রাণান্তেও মিথ্যা কহেন না। সাহেবেরা তাঁহার এই সকল গুণ দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং পর পর তাঁহাকে উচ্চ পদ প্রদান করিতে লাগিলেন। শেষে পদ্ম বাবু ঐ আফিসে ১০০ ৲ টাকা বেতনে রেজেষ্ট্রারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই বাঙ্গালী রেজেষ্ট্রারের পদটী কেবল পদ্মলোচনের জন্যই সৃষ্ট হয়, ইহা পূর্ব্বে ছিল না।

* যে আফিসে দেশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাবাদি থাকে।

আফিসে যত গুলি বাঙ্গালী কর্ম্মচারী ছিলেন, কেহই পদ্ম বাবুর মত শুদ্ধ করিয়া ইংরাজী কহিতে পারিতেন না। সুতরাং আফিসের সাহেবদিগের, কাহাকে কিছু বুঝাইতে হইলে বা কাহারও কোন কথা বুঝিতে হইলে, পদ্মলোচনকে মধ্যস্থ না রাখিলে চলিত না। সাহেবেরা অবসর কালে পদ্ম বাবুকে নিকটে ডাকিতেন এবং কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে, তিনি আফিসের বড় বড় কর্ম্মচারী সাহেব এবং যাঁহারা কোন কর্ম্ম করিতেন না, এরূপ অনেক প্রধান প্রধান স্বাধীন সাহেবদিগের আদরণীয় বন্ধু হইয়া উঠিলেন। তিনি যখন যাহা অনুরোধ করিতেন, সাহেবেরা তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাহ্য করিতেন। ক্রমে আফিসের মধ্যে তিনি এক জন প্রধান হইয়া উঠিলেন; ইচ্ছানুরূপ অনেক কার্য্য করিতে পারিতেন।

তিনি বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াই মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া বালীর বাড়ীতে গমন করিলেন। প্রতিদিন নৌকা করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বালীর লোকের ঘোরতর দুরবস্থা;— তাহাদের লেখা পড়া শিখিবার স্থান, কি অর্থ উপার্জ্জনের উপায় কিছুই ছিল না। তাহারা ভয়ানক দারিদ্র্য দুঃখে কষ্ট পাইত এবং পরস্পর পশুবৎ ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদা অসুখী থাকিত। গ্রামবাসিগণের এই দুরবস্থা দেখিয়া পদ্মলোচনের অন্তঃ-

করণ দুঃখে অভিভূত হইল। কিরূপে অবস্থা শুধরাইয়া তাহাদিগকে সুখী করিবেন, নিরন্তর সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে অনেক ভাবিয়া বালীর ডিংসাই পাড়ায় একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইত না; আবার যাহারা নিতান্ত দুঃখী—পুস্তকাদি কিনিতে অক্ষম, তিনি তাহাদিগকে নিজ ব্যয়ে পুস্তকাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি স্বয়ং শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাতঃকালে কিয়ৎ ক্ষণ শিক্ষা দিয়া ১০ টার পর কলিকাতায় যাইতেন; সেখানে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিয়াই বিদ্যালয়ের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার এই সময়ের পরিশ্রম মনে করিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে। ধন্য পদ্ম বাবু! ধন্য তোমার সাধু ইচ্ছা!

এইরূপে কয়েক বৎসর গত হইলে, পদ্ম বাবু একটু বিশ্রাম করিবার সময় পাইলেন। তাঁহার প্রধান প্রধান ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্য্যের ভার লইল; তিনি কেবল রাত্রিতেই তাহাদিগকে শিখাইতে লাগিলেন। যে দিন আফিস বন্ধ থাকিত, সে দিন বিদ্যালয়ের সমুদায় তত্ত্বাবধান করিতেন।

ছাত্রেরা যেমন এক প্রকার লিখিতে পড়িতে সমর্থ হইতে লাগিল, পদ্ম বাবু অমনি তাহাদিগকে আফিসে লইয়া গিয়া কর্ম্ম করিয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে

সাহেবেরা তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া বেতন বাড়াইয়া দিতে চাহিলেন। পদ্ম বাবু উত্তর করিলেন,—"আমার ১০০৲ টাকা বেতন যথেষ্ট হইয়াছে,—* * * আর বৃদ্ধির আবশ্যকতা নাই।" তিনি যে, একবার মাত্র ঐরূপ বলিয়াছিলেন এমত নয়, যখন যখন বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব হইত, তখনই ঐরূপ বলিতেন। তিনি যে, কেবল ঐ কথাটী মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহাও নয়, উহার সঙ্গে আরও কিছু বলিতেন, তাহা এই; কখন কহিতেন—"আমার হাতে এত কায পড়িয়াছে, একা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পরি না, আমাকে যে টাকা দিতে চাহিতেছেন, তাহাতে আমার দুই একটী সহকারীর পদ বাড়াইয়া দিন, এবং দয়া করিয়া ঐ সকল পদে আমার ছাত্রগণকে নিযুক্ত করুন। যে হেতু তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় নাই।" কখন বলিতেন,—"এই আফিসে আমার দুই এক জন প্রতিবাসী কর্ম্ম করিতেছে, দেখিতে পাই, তাহারা যে বেতন পায়, তাহাতে তাহাদের পরিবারের দুঃখ ঘুচে না; অতএব, আমাকে যে টাকা বাড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন, তাহা তাহাদিগকে দিন।" এই সকল কথা বলিবেন বলিয়াই তিনি নিজ বেতন-বৃদ্ধি বিষয়ে বারবার ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পদ্ম বাবু, গ্রামবাসি কোন ব্যক্তির দুঃখের কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। সাধ্যমত তাহার

প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেন। কেহ তাঁহাকে দুঃখের কথা জানাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সবিশেষ পরিচয় লইতেন। সেই পরিবারে যে কোন ব্যক্তি কিছু মাত্র লিখিতে ও পড়িতে পারিত, তাহাকে আফিসে লইয়া গিয়া কর্ম্ম শিক্ষার্থীরূপে নিযুক্ত করিতেন। ইহার মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে নিজ ব্যয়ে আফিসে যাইবার পোসাক করিয়া দিতেন। যখন দেখিতেন, তাহারা কার্য্যক্ষম হইয়াছে, তখন সঙ্গে করিয়া এক জন প্রধান সাহেবের কাছে লইয়া যাইতেন এবং কহিতেন,—“এই লোকটী বড় দুঃখী, লেখা পড়া যাহা জানে, কায চালা-ইতে পারিবে—অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার একটা উপায় করিয়া দিলে আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।” সাহেবেরা তাঁহাকে যেরূপ ভাল বাসিতেন, তাহাতে উক্ত অনুরোধ রক্ষা হইতে ক্ষণকালও বিলম্ব হইত না। তিনি এইরূপে বালীর অনেকের অন্নসংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন।

আমরা পদ্ম বাবুর সদ্‌গুণের আলোচনা করিতে করিতে মোহিত হইয়া উপযুক্ত স্থলে তাঁহার সাংসারিক বৃত্তান্ত বলিতে বিস্মৃত হইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তাহাই বলিতে চলিলাম। বোধ হয়, যে সময়ে তিনি বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন, সেই সময়েই খালনা জয়পুরের পালধিদিগের বাটীতে

তাঁহার বিবাহ হয়। পদ্মলোচন যেমন এক জন সদ্গুণ-শালী সাধু পুরুষ; সহধর্ম্মিণীও সর্ব্বাংশে তাঁহার অনুরূপ হইলেন। তাঁহার মন, দয়া ও সরলতায় ভূষিত ছিল।

পদ্মলোচন দুঃখির দুঃখ মোচনে যত অর্থ ব্যয় করিতেন, পরোপকারে যত সময় ক্ষেপণ করিতেন; তাঁহার সাধুশীলা প্রণয়িনী তাহাতে ততই সন্তুষ্ট হইতেন—কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। পদ্ম বাবু এরূপ স্ত্রী পাইয়া যে, পরম সুখী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি সেকালের সম্ভ্রান্ত কুলীনের ছেলে হইয়াও একের অধিক বিবাহ করেন নাই; ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

তাঁহার পিতার দুই সংসার। পদ্মলোচন জ্যেষ্ঠার সন্তান। যাঁহার দুই বা অধিক স্ত্রী থাকে, প্রায়ই তিনি ছোটটীর অধিক বাধ্য হন। গোকুলচন্দ্রও ঐ পথের পথিক হইয়াছিলেন। পদ্ম বাবুর বিমাতা অত্যন্ত সপত্নী-বিদ্বেষিণী। তিনি সতত সপত্নীর সহিত কলহ করিতেন; এবং নিরন্তর চেষ্টা করিয়া তদীয় পুত্রকে পিতৃঃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিলেন। পদ্মলোচন তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। তিনি বিমাতার প্রতি যত ভক্তি প্রকাশ করিতেন, "আপনি বিবাদ বিসম্বাদ করিবেন না" বলিয়া যত বুঝাইতেন, তিনি ততই তাঁহাকে শক্ত শক্ত গালাগালি দিতেন। পিতার স্নেহশূন্য ব্যবহার এবং বিমাতার

শত্রুতা, পদ্ম বাবু অনেক দিন অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন। শেষে দেখিলেন, বিমাতা কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না ; দিন দিন তাঁহার প্রতি অধিকতর অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কি করেন, পাছে তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে হয় ; পাছে রাগ করিয়া তাঁহার অবাধ্য হইতে হয় ;—এই আশঙ্কায় তিনি বালী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন ; এবং একটী বাড়ী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় বাস করিলেন বলিয়া বালী ভুলিয়া গেলেন না ; মাঝে মাঝে আসিয়া পিতা, বিমাতা ও প্রতিবেশি-গণের তত্ত্বাবধান করিয়া যাইতেন।

কালক্রমে পিতার শেষ দশা উপস্থিত হইল। এ-পর্য্যন্ত, তাঁহার যাহা কিছু অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল, মৃত্যুর দুই এক দিন পূর্ব্বে, সমস্তই তিনি পদ্মলোচনের অগো-চরে ছোট স্ত্রীকে ও তাঁহার গর্ভজাত সন্তানগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। পিতা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছেন শুনিয়া পদ্মলোচন দেখিতে গেলেন। পিতাকে তীরস্থ করার পর পিতৃব্য কহিলেন, দাদা মহাশয়ের কিছু আছে ; এই বেলা জিজ্ঞাসা করিয়া লও। পদ্মলোচন কহিলেন,—"তাঁহার কিছু আছে কি না এখন আর জিজ্ঞাসা করিব না। আমি জানি, তিনি আমা অপেক্ষা আমার বৈমাত্রের ভ্রাতৃ-গণকে অধিক ভাল বাসেন ; যদি কিছু থাকা সত্য হয়,

তাহাদিগকেই দিয়া আসিয়াছেন। এখন আমি জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কহিতেও পারেন। অতএব আমি অন্তিম কালে আর তাঁহাকে মিথ্যা বলাইতে অভিলাষ করি না; তবে উহাঁর ঋণ আছে কি না জিজ্ঞাসা করা উচিত।” পরে পদ্মলোচন পিতাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সহজেই অনেক ঋণের হিসাব দিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে পদ্মলোচন কর্জ্জ করিয়া শ্রাদ্ধশান্তি ও পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিলেন। এই সূত্রে তাঁহাকে কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিতে হইল, তথাপি বিমাতা কি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের নিকট এক পয়সাও সাহায্য চাহিলেন না। কলিকাতার বাটী বিক্রীত হওয়াতে অগত্যা তাঁহাকে পুনর্ব্বার বালীর বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে হইল।

পদ্মলোচনের শেষ দশায় যে সকল সাংসারিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, শুনিলে সকলেই দুঃখিত হইবেন। কিন্তু পদ্মলোচন ধৈর্য্যগুণে সেই সকল দুঃখ অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার চারিটী পুত্র সন্তান হয়; তাহার মধ্যে তিনটী সুশিক্ষিত হইয়া কায কর্ম্ম করিতেছিলেন; কনিষ্ঠটী হিন্দুকালেজে পড়িতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ, তিনটী পুত্রই ক্রমে ক্রমে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই প্রাণাধিক পুত্রগণের বিয়োগে পদ্মলোচন শোকান্ধ হন নাই। মধ্যম পুত্র গুরুদাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে পদ্মলোচন অবিচলিত চিত্তে এক

জন বিদেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন॥ কি আশ্চর্য্য! আবার পর দিন প্রভাতেই শোক সন্তাপ বিস্মৃত হইয়া একটী অনাথ বালককে কলিকাতার দাতব্য সমাজে লইয়া গেলেন।

পদ্মবাবু দুটী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। স্কুল সংস্থাপন করিয়া বালকগণকে লেখা পড়া শিখাইতেন বলিয়া বালীর লোকেরা তাঁহাকে "স্কুল মাষ্টার" বলিয়া আদর করিত। লোকে এখন যেমন ঐ উপাধিকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না, পূর্ব্বকালে তা ছিল না;—সে সময়ে "স্কুল মাষ্টার" উপাধি যথেষ্ট প্রশংসারই ছিল। এবং সাহেবেরা তাঁহার সত্যবাদিতা ও স্বার্থশূন্য পরোপকারিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "লর্ড" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। স্যারা, উইঞ্চ, গ্র্যাস প্রভৃতি বড় বড় সিবিলিয়ান সাহেবেরা তাঁহাকে 'লর্ড পদ্ম' বলিয়া আহ্বান করিতেন। ইংলণ্ড সদৃশ সভ্যতম দেশের সর্ব্বপ্রধান শ্রেণীস্থ লোকেরা লর্ড বলিয়া আখ্যাত হন। ইংলণ্ডে কিরূপ লোকেরা উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হন তাহা, ইহা বলিলেই কতক বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রধান শাসনকর্ত্তা সর্ জন্ লরেন্স্ অদ্যাপি লর্ড উপাধি * প্রাপ্ত হন নাই। পাঠকগণ এখন

* সর্ জন্ লরেন্স্, এদেশের কর্ম্মত্যাগ করিয়া বিলাত যাওয়ার পর লর্ড উপাধি পাইয়াছেন।

বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রাগুক্ত সাহেবেরা লর্ড বলিয়া পদ্ম বাবুর কি পর্য্যন্ত সম্মান বৃদ্ধি করিতেন।

পদ্ম বাবু, বলবতী দয়া ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। আবার ইংরাজী শিক্ষার গুণে ঐ দুই বৃত্তি আরও সতেজ ও মার্জ্জিত হইয়াছিল। পরের দুঃখ শুনিলেই তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া যাইত; যত ক্ষণ সেই দুঃখের প্রতিবিধান করিতে না পারিতেন, তত ক্ষণ তাঁহার মনের স্থিরতা থাকিত না।

তিনি অত্যন্ত নিরীহ ছিলেন। অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিলেও কোনরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। এক বার সাহেবেরা তাঁহাকে প্রধান পোষ্ট আফিসের দেওয়ানী দিতে চাহিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, "ঐ শ্রেণীতে অনেক অভদ্র লোক কর্ম্ম করিয়া থাকে; যদি তাহাদিগের মধ্যে কেহ কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম করে,—আমাকে লজ্জিত হইতে হইবে; অতএব আমার ঐ কর্ম্ম করিতে অভিলাষ নাই।" পরে সাহেবেরা অনেক বুঝাইয়া এবং অধিক গোলমাল নাই দেখিয়া, তাঁহাকে উক্ত পোষ্ট আফিসের অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন পরে একটী লোক তাঁহার নিকটে কোন কর্ম্মের প্রার্থনা জানাইল; তিনি তাহাকে সে কর্ম্ম দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সেই নূতন ব্যক্তি টাকা চুরি করিয়া ফাটকে গেল। তাঁহার চোকের উপর এক

ব্যক্তি এইরূপ কুকর্ম্ম করিল এবং তাহার উপস্থিত দুঃখের প্রতীকার করা আপনার ক্ষমতাতিরিক্ত দেখিয়া আগ্রহের সহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

তিনি যখন কলিকাতায় থাকিতেন, তখন নীলমণি দে নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ইনি ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। পদ্ম বাবু তাঁহার সহিত ইংরাজী শিক্ষার উন্নতিসাধনে ও ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উভয়ের মনের ভাব প্রায় সকল বিষয়েই একরূপ ছিল; সুতরাং তাঁহাদের বন্ধুত্ব যে অত্যন্ত সুখজনক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।

পদ্মলোচন যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা শক্তির উপাসক। কিন্তু শক্তি উপাসনার প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। তিনি শাক্তগণের উপাসনা-প্রণালী দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার পিতা যখন দুর্গোৎসব কি শ্যামাপূজা উপলক্ষে বান্ধবগণের সহিত মহাড়ম্বরে বলিদান করিয়া আমোদ করিতেন, তিনি তখন নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কোন প্রতিবেশির গৃহে অবস্থান করিতেন। বলিদানের কোলাহল কর্ণগোচর হইলে তিনি রোদনোন্মুখ হইতেন। ঈদৃশ জঘন্যাচার-পরিশূন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার গোড়াগোড়ি শ্রদ্ধা ছিল। এক্ষণে নীলমনি বাবুর

সহিত আলাপ হওয়াতে সহজেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

পদ্মলোচন অত্যন্ত সত্যপ্রিয় ছিলেন। জীবিতকালের মধ্যে কখন জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা কহেন নাই। কাহাকে মিথ্যা কহিতে দেখিলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেন। বালী নিবাসী কোন ব্যক্তির দুঃখের কথা শুনিবামাত্র পদ্ম বাবু তাহার গৃহে গমন করিতেন এবং নানা প্রকার উপায় দ্বারা সেই দুঃখের প্রতীকার করিতেন। প্রতিবেশি কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে ঔষধপথ্য দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাকে কেহ কখন কোন রিপুর বশীভূত হইতে দেখে নাই। তিনি আপন মনের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সামান্য ভাবে কালযাপন করিতেন। যার পর নাই বিনীত ছিলেন। যদি কোন উপকৃত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাঁহার নিকট [illegible] উপকারের কথা উপস্থিত করিত, তিনি "রাম! রাম!" বলিয়া কাণে হাত দিতেন। দাতব্য কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়া যে অবকাশ থাকিত তাহা তুলসীর মালা হস্তে অভীষ্ট দেবের স্মরণে ও কয়েকটী সাধু শিষ্যের সহিত ধর্ম্ম আলাপ-সুখে অতিবাহিত করিতেন।

তিনি শরীর রক্ষা বিষয়েও অমনোযোগী ছিলেন না। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান

করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেন। পরে কিছু কাল ব্যায়াম করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। মৎস্য মাংস আহার করিতেন না। অপরাহ্নে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া বায়ু সেবন করিতেন। এই সকল কারণে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সবলশরীর ছিলেন। শরীরশ্রী এরূপ উত্তম ছিল যে, তাঁহাকে দেখিলেই মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হইত।

তিনি বরাবর স্বোপার্জ্জিত অর্থে আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন; কখন কোন বিষয়ে কাহারও সাহায্য লন নাই। তাহার প্রমাণ এই;—তিনি পেন্‌সন লইয়া তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন; গমন কালে তৃতীয় পুত্রের নিকটে যে ১০০৲ টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, পেন্‌সনের টাকা পাইবামাত্র তাহা বৃন্দাবন হইতে পাঠাইয়া দেন।

কিছু কাল ভ্রমণ করিয়াই গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। পরে ১২৪৭ সালে (১৮৪০খৃঃ) বাষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে কিছুই সংস্থান ছিল না। তাঁহার মৃত্যুতে বালীগ্রাম তখন যে অনাথ হইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

যে বালী এক্ষণে এদেশের মধ্যে একটী গণনীয় গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে; এখন যাহার এমন পাড়াই নাই, যাহাতে দুই চারি জন সুশিক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়

না; যাহার শত শত লোক এখন নিঃস্বার্থে পরের হিতকর কার্য্যে মন দিতেছেন; শুভকরী সভা ও শুভকরী পত্রিকা যেখানে আপনাদের নাম স্বার্থক করিয়া বহু দিন বিরাজিত ছিলেন; পদ্মলোচন বাবুই সেই বালীর এতাদৃশ উন্নতির নিদান,—একথা কে অস্বীকার করিবে?

পদ্ম বাবুর জীবন-তরুর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলে লোকের চৈতন্য হয়; ভয় ও বিস্ময়ের সহিত মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় যে, মনুষ্য কি পদার্থ এবং তাহাদিগকে কি ভাবে চলিতে হইবে, দেখাইবার জন্যই পদ্ম বাবু পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন!!

বালকগণ! যদি মানুষ হইতে চাও—বড় হইতে চাও—দেশবিদেশে বিখ্যাত হইতে চাও—মনুষ্য ও ঈশ্বরের প্রিয় হইতে চাও—এবং যদি সুখী হইতে চাও, মহাত্মা পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত্র অনুকরণ কর।

মতিলাল শীল।

পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে মানুষের কি পর্য্যন্ত উন্নতি হইতে পারে, মতিলাল শীলের জীবনচরিত পাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।

প্রায় সোত্তর বৎসর হইল, চৈতন্যচরণ শীল নামে এক জন স্বর্ণবণিক্ কলিকাতায় কলুটোলায় বাস করিতেন। তিনি মধ্য-বিত্ত ও বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা সন্তান জন্মে। এই পুত্রের নাম মতিলাল, ১১৯৮ সালে (১৭৯১ খৃঃ) ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর প্রায় পাঁচ বৎসর বয়সের সময় চৈতন্যচরণ পরলোক গমন করের।

মতি শীল, লেখা পড়া শিখিবার জন্য প্রথমে গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় গিয়াছিলেন। সেখানে যত দূর হইতে পারে, কিছু দিনের মধ্যে সে সমুদায় শিক্ষা করিলেন। বাঙ্গালা লেখায় এমন হাত পাকিল এবং শুভঙ্করের অঙ্কপ্রণালী এমন উত্তমরূপে শিখিলেন যে, তাঁহার অক্ষর ও অঙ্ককষা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইত ও তাঁহার বুদ্ধির কতই প্রশংসা করিত। তিনি লেখা

পড়া শিখিবার উপযুক্ত সুযোগ পান নাই ; কিন্তু যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিই তাহার প্রধান কারণ।

১৭। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, কলিকাতার মধ্যে সুরতির বাগান নিবাসী মোহনচাঁদ দের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার কিছু দিন পরে আনুমানিক ১২১৯ সাসে শ্বশুরের সঙ্গে উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় তীর্থ দর্শনে গমন করিলেন। বৃন্দাবন, জয়পুর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করা হইল। সুতরাং এই তীর্থ দর্শনানুরোধে তাঁহার বিষয়িজনোচিত দিগদর্শন ঘটিয়া গেল। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ১২২২ সালে (১৮১৫ খৃঃ) বিষয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলিকাতা সহরে যে গড় আছে ; যেখানে গবর্ণমেণ্টের নানা প্রকার জিনিসপত্র ও সৈন্যসামন্ত থাকে ; মতি শীল প্রথমে সেই স্থানে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্ম করিতে করিতেই ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়।

১২২৬ সালে (১৮১৯খৃ) বোতল ও কর্কের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ছোলা কিনিয়া কৃষ্ণ পান্তী যেমন অসঙ্গত লাভ করেন, ঐ ব্যবসায়ে মতি শীলেরও প্রায় সেইরূপ হইয়াছিল। অতি অল্প মূল্যে রাশীকৃত বোতল ও কর্ক কিনিয়া, বিলক্ষণ চড়া দামে বেচিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই লাভই তাঁহার উন্নতি ও উৎসাহের মূল।

ইংলণ্ড হইতে কোম্পানির যে সকল বাণিজ্য জাহাজ কলিকাতায় আসিত, মতি শীল কিছু দিন পরে কেল্লার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহার কাপ্তেন সাহেবদিগের মুচ্ছুদ্দি হন। জাহাজে যে সকল দ্রব্য আসিত তাহা বেচিয়া দিতেন এবং তাঁহাদিগকে এতদ্দেশীয় বিবিধ দ্রব্য কিনিয়া দিতেন। ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ সম্মান ছিল ও যথেষ্ট লাভ হইত। ক্রমাগত নয় বৎসর এই কার্য্য করেন।

১২৩৫ সালে (১৮২৮ খৃঃ) তিনটী হৌস অর্থাৎ ইয়ুরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ হইলেন। স্মিথ্‌সন্ হোগুস্ ওয়ার্থ, লিভিংষ্টোন্ এবং লিচ্ কেটেল্ ওয়েল্ এই তিন সাহেব উক্ত তিন কুঠীর অধিকারী ছিলেন। ক্রমশঃ অনেক বড় বড় বণিক্ সাহেবের কুঠীর অধ্যক্ষ হইলেন। এখন তিনি পরিশ্রমজনক এত অধিক কার্য্যে আসক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা এমন সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতেন যে, শুনিতে বিস্মিত হইতে হয়। সমুদায় কুঠীর প্রাত্যহিক উপস্থিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিত্য নিত্য আয় ব্যয়ের হিসাব পরিষ্কার করিতেন। প্রতিদিন ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেন, "নিত্য নিত্য পরিষ্কার করিবার কারণ এই যে, কাহার নিকট কত দেনা এবং কাহার কত পাওনা তাহা নিত্যই জানিতে পারি এবং যদি কেহ প্রাপ্য টাকা চাহে, তৎক্ষণাৎ দিতে

পারি।” এই সময়ে তিনি কেবল কুঠীর কার্য্য করিতেন এমত নহে—নিজের বাণিজ্যও বিলক্ষণ বাড়াইয়াছিলেন। বোতল ও কর্ক ব্যতীত দেশীয় ও উয়ুরোপীয় ভুরি প্রমাণ বিবিধ দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

মতি শীল ক্রমে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন। যখন কুঠী ওয়ালা সাহেবদের কারবার বন্ধ হইয়া যায়, সেই সময়ে স্মিথ্‌সন্ সাহেবের কলিকাতাস্থিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী ময়দার কল ক্রয় করেন। এই কল অতি অদ্ভুত পদার্থ; বাষ্পের বলে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। যে বাড়ীতে এই যন্ত্র স্থাপিত ছিল, গোম আনিয়া সেই বাটীর স্থান বিশেষে রাখিয়া দিলেই কিছু কাল পরে রাশীকৃত প্রস্তুত ময়দা পাওয়া যায়,—আর কিছুই করিতে হয় না। এই কল অদ্যাপি কলিকাতায় আছে; এখন এক সাহেব, ভাড়া লইয়া উহার কার্য্য চালাইতেছেন।

ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার টাকা উপার্জ্জনের ইচ্ছা বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি কখন টাকার জন্য অসৎপথে গমন করেন নাই এবং দুরাকাঙ্ক্ষও ছিলেন না। যখন তাঁহার ঘরে চারিদিক্ হইতে অজস্র অর্থ আসিতেছিল, সেই সময়েই তিনি ভাড়াটিয়া বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অনেক ভূমি ও গৃহ ক্রয় করিলেন। এইরূপ দেখিয়া যাহারা তাঁহাকে অর্থগৃধ্নু মনে করিবেন, তাঁহাদিগের এই বিবে-

চনা করা উচিত যে, লোকের ভাল করিব বলিয়া উচ্চ পদ গ্রহণ বা বিপুল অর্থোপার্জ্জন, কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে। লোকের ভাল করিবার ইচ্ছাই যে, তাঁহাকে অর্থো-পার্জ্জনে নিয়োজিত করিয়াছিল, যদিও একথা নিঃসং-শয়ে বলিতে পারা যায় না, কিন্তু তাঁহার অর্থে দেশের বিস্তর উপকার হইয়াছিল, এই জন্যই আমি এরূপ ইচ্ছা করি না যে, লোকে তাঁহাকে অর্থগৃধ্নু বলেন। সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, তিনি ধনের প্রকৃত প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

যে সময়ে, গবর্ণর জেনারেল মাকুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ বাহাদুর এদেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে বহু সংখ্যক বিদ্যালয় ও সমাজ সংস্থাপিত করেন এবং বঙ্গ দেশীয় অনেক বড় বড় লোককে তাঁহার সহায়তা করিতে উৎসাহিত করেন; সেই সময়েই মতি শীলের অন্তঃকরণে দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইবার ও দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিবার অভিলাষ জন্মে। কিন্তু তখন তাঁহার অবস্থা তাদৃশ উন্নত ও অভীষ্টপূরক ছিল না। এক্ষণে সময় পাইয়া ১২৪৯ সালে (১৮৪২খৃঃ) কলিকাতার অন্তর্গত পটলডা-ঙ্গায় একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন। "শীল্স্ কালেজ" ইহার নাম হইল। প্রথমে ছাত্রগণের নিকট

একটাকা করিয়া বেতন * লইতেন। কাগজ, কলম, পুস্তক প্রভৃতি যাহা কিছু পাঠার্থীগণের প্রয়োজনীয়, সমুদায়ই নিজে দিতেন। পরে ঐ বিদ্যালয় "হিন্দু মেট্রপলিটেন" কালেজের সহিত মিলিত হইয়া গেল। কিছু দিন পরে, মেট্রপলিটেন কালেজ উঠিয়া গেলে, উহা পুনরায় পৃথক্ হইয়া পড়িল। এই সময়েহ মতি শীল বালগণের নিকট হইতে বেতন লওয়া এবং তাহাদিগকে কাগজ কলম দেওয়া রহিত করিয়া "শীল্স্ ফ্রী কালেজ" † নাম দিলেন। উহা অদ্যাপি বাহির সিমলা শঙ্কর ঘোষের গাল ১নং বাটীতে সেই অবস্থাতেই চলিতেছে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ বিদ্যালয়ের অবস্থা এইরূপ ছিল ;— ৩৩০ জন ছাত্র পাঠাভ্যাস করিত এবং অন্যূন পাঁচ শত টাকা উহার মাসিক ব্যয় ছিল। বোধ হয়, বর্ত্ত-মান কালে উহার অবস্থা সেইরূপই আছে। ঐ বিদ্যা-লয় চিরস্থায়ি করিবার জন্য তিনি সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া গিয়াছেন।

১২৩৬ সালে (১৮২৯ খৃঃ) যখন লর্ড বেণ্টিক বাহা-দুর এই দেশের সতীদাহের ভয়ানক প্রথা রহিত করেন,

* সে সময়ে অনেকের এইরূপ সংস্কার ছিল এবং অদ্যাপিও কাহার কাহার আছে যে, বিনা বেতনে বালক পড়ান অপমানের বিষয়। এই নিমিত্তই প্রথমে বেতন লওয়া যাইত।

† মতিলাল শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়।

তখন এদেশীয় কতকগুলি লোক সহগমনের স্বপক্ষে ও বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের বিপক্ষে কলুটোলায় একটী "ধর্ম্ম-সভা" স্থাপন করেন। সভার সভ্যগণ বহু দিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সঙ্কল্প বিফল করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সভায় নিরন্তরই দলাদলি, জাতিমারা প্রভৃতি বিষয় লইয়া মহা গোলযোগ হইত। যে বৎসর মতিশীল পটলডাঙ্গায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন, সেই বার এক দিন ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইয়া, তিনি একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই ;—"হে সভ্যগণ! আপনারা সর্ব্বদা যে সকল আলোচনা ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা কোন প্রকার ধর্ম্ম সাধন হইতেছে না। অতএব আপনারা এরূপে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে আপনাদের ধর্ম্মসভার নাম সার্থক হয়, এতাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।" যাহাতে সভার ব্যয় হইতে দেশের অনাথ ও অক্ষমদিগের ভরণপোষণ হয়, সভ্যগণকে তাহার অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দিলেন। কেবল মাত্র তাঁহার যত্নে ও বিশিষ্ট সাহায্যে ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। যাহারা আত্ম ভরণপোষণে অসমর্থ,—যাহাদিগের ভরণ-পোষণ করিবার লোক নাই, কলিকাতাবাসি এমন শত শত লোক মতিশীলের দয়া ও দাতব্যগুণে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে লাগিল। কালক্রমে অন্যান্য দাতারা দান-ধ্যান

বন্ধ করিলেন; ধর্ম্ম সভাও উঠিয়া গেল; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুশীল মতি শীলের দানশীল হস্ত পূর্ব্ববৎ প্রসারিতই রহিল। এই ব্যাপার ঘটিলে, ১২৫৪ সালে (১৮৪৭খৃঃ) তিনি আপনার বিষয় হইতে ঐ কার্য্যের এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যে, কলিকাতাবাসি অনেক নিরাশ্রয় দরিদ্র লোক অদ্যাবধি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

তিনি যে সময়ে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন; যে সময়ে ধর্ম্ম-সভায় সমাগত হইয়া অনাথ পালনের উপায় করিয়াছিলেন; সেই সময়ে আর একটী এমন কার্য্য করেন যে, সকলেই একবাক্যে তাহাকে প্রধান সৎকার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।—কলিকাতার প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে এবং কলিকাতা হইতে যে রাজপথ বারাকপুরে গিয়াছে, তাহার পূর্ব্ব ধারে "বেল-ঘরিয়া" নামে এক খানি গ্রাম আছে। তথায় পূর্ব্ব-বাঙ্গালা (ইষ্টারন্ বেঙ্গল) রেলওয়ের একটী ষ্টেসন হইয়াছে; ইহাই উহার যথেষ্ট পরিচয়। সদাশয় মতি শীল ঐ স্থানে একটী অতিথিশালা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেখানে, অদ্যাবধি প্রতিদিন ন্যূনাধিক চারি শত (কখন কখন ৭।৮ শত অতিথিও এককালে সমাগত হয়!) ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ইচ্ছানুরূপ পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হয় এবং তাঁহার গৌরবান্বিত নাম কীর্ত্তন করিয়া পুলকিত হয়। আহা! অজ্ঞাত বিদেশাগত—

শীতাতপপীড়িত—ক্ষুৎপিপাসাকাতর—নিঃস্বম্বল—পরিশ্রান্ত পথিকের বিষণ্ণ বদনে যাঁহার কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়, তিনিই মহাত্মা! তাঁহারই জীবন সার্থক! তাঁহারই অর্থোপার্জ্জন সার্থক!

মতি শীল, এইরূপ সৎ বিষয়ের অনুষ্ঠান ও আলোচনায়, জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার অনেকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল। কোন্ কর্ম্ম কিরূপে করিলে কিরূপ ফল হইবে, তিনি পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পরিতেন। পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। বুঝিবার দোষে কোন বিষয়ে কষ্ট পাইলে আর সে দিকে যাইতেন না। তিনি বিলক্ষণ সদ্ব্যয়ী ছিলেন; একটী পয়সাও অপব্যয় করিতেন না। তাঁহার নিত্য খরচের বাহুল্য হইলেও তাহাতে সামঞ্জস্য ছিল। কোন কারণ বশতঃ যদি কাহার প্রতি একবার বিদ্বেষ জন্মিত, জন্মাবচ্ছিন্নে আর তাহার সহিত কথা কহিতেন না। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ বা যত বড় লোকেই হউন, কাহাকেও ন্যায্য কথা বলিতে ছাড়িতেন না। যেমনই জটিল বিষয় হউক না, আপনার বুদ্ধির দ্বারাই তাহার একরূপ মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি এমন উত্তম ও অভ্রান্ত ছিল যে, বড় বড় সাহেবেরাও তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। আচারভ্রষ্ট স্বধর্ম্ম-ত্যাগী কিম্বা গোঁড়া হিন্দু-

দিগের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন। জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান অনুষ্ঠের কর্ম্ম কাণ্ড সম্পাদন করিতে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া শরণাগত হইলে, তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেন। দুঃখির দুঃখ দেখিয়া কাতর হই-তেন ; পরোপকারে বিমুখ হইতেন না। যাহা বলিতেন কদাপি তাহার অন্যথা করিতেন না।

তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গৌরচন্দ্র শীল ধনবান্ ছিলেন। পুত্র না থাকায় তিনি মৃত্যুকালে আপনার এক কন্যাকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান। সেই কন্যা অক্ষম ছিলেন বলিয়া মতি শীলের উপরে বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমা-বস্থায় ঐ বিষয় হইতে মূলধন লইয়া নিজে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে, সে টাকা কেন, তিনি আরও অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা না করিয়া, সময়ে ঐ ট[illegible] গণ্ডার হিসাব করিয়া পরিশোধ করিয়াছিলেন। তিনি এই পরিবারের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহা-দিগের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেন। বালকগণ! দেখ, এই আখ্যানে, তাঁহার কিরূপ মনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে!

তিনি, যে স্মিথ্‌সন্‌ হোওস্‌ ওয়ার্থ সাহেবের কাছে কর্ম্ম করিয়া উন্নত হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী দুঃখে পড়িয়া অনেক দিন এই দেশে ছিলেন। মতি শীল, তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম—অনেক যত্ন ও অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এমন কি! বিবি ইংলণ্ডে গমন করিলে পর, তিনি সেখানেও টাকা পাঠাইয়া দিতেন।

তাঁহার স্মৃতি ও তর্কশক্তি বিলক্ষণ বলবতী ছিল। রীতিমত শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু সর্ব্বদা ইংরাজদিগের সঙ্গে থাকিতেন বলিয়াই, দেখিয়া শুনিয়া কার্য্যোপযোগি ইংরাজী লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন; প্রায় সকল বিষয়ই বুঝিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে পারিতেন।

তাঁহার বাবুগিরী ছিল না; স্বভাব পূর্ব্বাপর একই রকম ছিল। ধুতি, চাপকান ও হাতেবাঁধা পাগড়ী তাঁহার চিরজীবনের কুঠীর পরিচ্ছদ ছিল। লোকের টাকা কড়ি হইলে প্রায়ই জমীদার হইব, অনেকের প্রভু হইব বলিয়া অভিলাষ হইয়া থাকে; তাঁহার তাহা ছিল না। ঋণদান হইতেই তাঁহার ভূমাধিকারের সূত্রপাত হয়। তিনি যাহাদিগকে টাকা ধার দিয়াছিলেন, তাহাদিগের অনেকেই নগদ টাকা দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া তালুক বিনিময় করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার সন্তানগণের যত্নে ঐ জমীদারী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

যাহা হউক, যিনি এত গুণের লোক ছিলেন ; যিনি কেবল মাত্র আপনার বুদ্ধি, পরিশ্রম ও যত্ন দ্বারাই উন্নতি তরুর উচ্চতম শাখার ফলভোগ করিয়াছিলেন ; যিনি নানা প্রকার সৎকর্ম্মদ্বারা লোকের উপকার ও আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন ; যিনি অনাথের নাথ, বিপন্নের শরণ ও বণিক্কুলের আভরণস্বরূপ ছিলেন ; সেই মতিলাল শীল ২। ৩ দিন রোগ ভোগ করিয়া অবশেষে ১২৬১ সালের (১৮৫৪ খৃঃ) ৭ই জ্যৈষ্ঠ রজনীযোগে আপনার প্রস্তুত গঙ্গার বাঁধা ঘাটে ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মানব লীলা সম্বরণ করেন। শুনিয়াছি, অন্তিম কালেও, মরিবেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। তিনি নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব মধ্যমাকৃতি শ্যামবর্ণ মনুষ্য ছিলেন।

এক্ষণে তাঁহার পুত্রেরা মহা সমারোহে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। তাঁহাদের সমৃদ্ধির সীমা নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর। জ্যেষ্ঠ হীরালাল, মধ্যম চুনিলাল, তৃতীয় পান্নালাল, চতুর্থ গোবিন্দলাল, এবং কনিষ্ঠ কানাইলাল ; পাঁচ জনই বর্ত্তমান। কন্যাও পাঁচটী ; তাঁহারা সকলেই সৎপাত্রে প্রদত্তা হইয়াছেন। মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে লোকে "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হও" বলিয়া থাকে ; মতি শীল বাস্তবিকই সেই আশীর্ব্বাদের ফলভাজন হইয়াছিলেন।

আমরা এখন প্রার্থনা করি, আমাদের দেশে এতাদৃশ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। যাঁহাদের ধন ও ক্ষমতা হইতে এক্ষণে দেশের মঙ্গল না হইয়া বরং অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাঁহারা মতিলাল শীলের অনুকরণ করুন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইনি, ১২৩১ সালে (১৮২৪ খৃঃ) কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুরে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এক জন প্রধান কুলীন ছিলেন। তাঁহার সাত বিবাহ। এই সাত পত্নীর মধ্যে হরিশের মাতা সর্ব্ব কনিষ্ঠা। হরিশের জননী, ভবানীপুর নিবাসী কোন সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন লোকের দৌহিত্রী; ইনি অদ্যাপি জীবিত আছেন। কুলীনেরা বিবাহিতা স্ত্রীগণকে প্রায় গৃহে লইয়া যায় না; স্ত্রীরা আপন আপন সন্তানাদি লইয়া পিত্রালয়েই বাস করে। হরিশের মারও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। তিনি মামার বাড়ী থাকিতেন; সেই স্থানে থাকিয়াই তাঁহার বিবাহ হয়; সুতরাং মার মামার বাড়ী-তেই হরিশের জন্ম হইয়াছিল।

তিনি অতি শৈশব কালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ে নিকট, বাড়ীতে ইংরাজী বর্ণমালা শিক্ষা করেন। সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভবানীপুরের কোন ইংরাজী বিদ্যালয়ের পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বেতন দিবার সঙ্গতি ছিল না বলিয়া তিনি স্কুলের অবৈতনিক

বালকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ, অতি অল্প দিনের মধ্যে, হরিশকে এক জন বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী শিক্ষার্থী বলিয়া জানিতে পারিলেন। তিনি আপনার প্রাত্যহিক পাঠগুলি এমন তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতেন এবং এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন যে, বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক সেই জন্য সতত শঙ্কিত থাকিতেন। হরিশ অতিশয় শ্রম ও মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন।

ছয় সাত বৎসর পড়া হইলে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে হিন্দুকালেজের ছাত্রগণের সহিত কোন বিশেষ পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করিলেন। এই পরীক্ষায় প্রস্তুত হইতে হইলে যত দিন পড়া আবশ্যক, তদুপযুক্ত সময় না পাওয়ায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তিতে মোহিত হইয়াই কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রকৃত বিষয় নিরূপণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ঐ অনুরোধ করেন।

এই পরীক্ষার পর তিনি স্কুলের পড়া ছাড়িয়া কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। জীবিত কালের মধ্যে আর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই। কিছু দিন পরে নিলাম কারক কোন বণিক্ সম্প্রদায়ের আফিসে একটী ৮৲ টাকা বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। অনেক দিন পরে আর দুই টাকা বৃদ্ধি হইয়া দশ টাকা হইয়াছিল। মেঃ

টলা নামক এক সাহেব ঐ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। হরিশ বাবু প্রত্যহ অভিনব উৎসাহের সহিত ভবানীপুর হইতে টলার আফিসে কর্ম্ম করিতে যাইতেন। যেরূপে ছাতা হাতে—পান চিবাইতে চিবাইতে—লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া নির্ভয় চিত্তে গমন করিতেন এবং ঐ সামান্য কর্ম্মে যেরূপ শ্রম ও যত্ন করিতেন তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রথমাবস্থায় মিত্রগণ বুঝিয়াছিলেন, তিনি ভবিষ্যতে এক জন বড় লোক হইবেন।

বিদ্যালয় ছাড়ার পর এবং টলার আফিসে কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, হরিশ অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন। অধিক কি বলিব অন্নকষ্ট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বরাহনগর নিবাসী কোন বন্ধুর নিকট সেই অবস্থার এইরূপ গল্প করিয়াছিলেন; "এক দিন ঘরে কিছুমাত্র খাবার সংস্থান ছিল না। এমন পিতলের বাসনও ছিল না যে, তাহা বন্ধক দিয়া সে দিনের খরচ চালান। বিষন্ন ও গম্ভীর ভাবে আপন দুর্ভাগ্য চিন্তা করিতেছেন; এতাদৃশ দুঃখের অবস্থায় পড়িয়াও বিশ্বপালক বিধাতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন বিশ্বাস হইতেছে না; এমন সময়ে এক জন জমীদারের মোক্তার আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র উৎকৃষ্ট ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিতে কহিলেন এবং তাহার পারি-

তোষিক স্বরূপ দুইটী টাকা দিতে চাহিলেন। হরিশ ঐ দুইটী টাকাকে দুইটী মোহর বিবেচনা করিয়া মোক্তারের কায সারিয়া দিলেন।” এই গল্প দ্বারা তাঁহার বাল্য জীবনের দুইটী বিষয়ের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ; তিনি বাল্যকাল হইতেই ইংরাজী লিখিতে এবং ঈশ্বর চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি যে বালক কালেই ইংরাজী ভাষাতে রচনা করিতে পারিতেন, তাহার আরও একটী প্রমাণ আছে। তিনি কাহাকে ইংরাজীতে দরখাস্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন ; সেই দরখাস্ত লেখা দ্বারাই তিনি টলার আফিসের চাকরী পান। ফলে, বিষম ক্লেশকর অন্ন-চিন্তা বশতই, তাঁহাকে বাল্যকালে স্কুল ত্যাগ করিতে ও টলার আফিসে তাদৃশ সামান্য বেতনের কর্ম্ম গ্রহণে প্রবর্ত্তিত হইতে হইয়াছিল। সমূহ অপ্রতুল ও উত্তেজনা সত্বেও, অন্যায় পথে অর্থোপার্জ্জন করিবার লালসা তাঁহার অন্তঃকরণে কখন উদয় হয় নাই। যে আট দশ টাকা বেতন পাইতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন ; বেতন বৃদ্ধির জন্য কখন প্রভুগণকে বিরক্ত করেন নাই।

এই স্থানে তিনি অনেক দিন কায করিয়াছিলেন। পরে ১২৫৮ সালে (১৮৫১ খৃঃ) কোন সৈনিক কার্য্যা-লয়ে ২৫৲ টাকা বেতনের একটী পদ শূন্য হইল। ঘোষণা হওয়াতে সম্বাদ পাইয়া হরিশ উহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ কর্ম্মে ক্রমশঃ উন্নতির সম্ভাবনা

ছিল বলিয়া উহা পাইবার জন্য অনেকেই অভিলাষী-হইয়াছিলেন। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগকে একটী পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। সেই পরীক্ষায় হরিশ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেন দেখিয়া, অধ্যক্ষগণ তাঁহাকেই সেই কর্ম্মে নিয়োজিত করিলেন।

হরিশের বুদ্ধি-শুদ্ধি দেখিয়া এবং স্বাভাবিক গুণ-গ্রামে বাধিত হইয়া মেঃ ফেল্‌নার, মেঃ মেকেঞ্জি প্রভৃতি অধ্যক্ষেরা ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে মিত্র-জ্ঞানে ব্যবহার করিতেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষায় ও অধ্যয়নে একান্ত অনুরাগী ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে সদুপদেশ ও পাঠ্যপুস্তক দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি আরও নানাবিধ পুস্তক পড়িতে পাইবার আশয়ে, আপনার সেই অল্প বেতন হইতে মাসিক দুই টাকা দাতব্য স্বীকার করিয়া, কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়ের স্বাক্ষরকারী হইলেন। এই সময় হইতে ইচ্ছামত পুস্তক দেখিতে পাইতেন। কুঠীর অবকাশ কালে, তিনি "মেট্‌কাফ্‌ হলে" উপবিষ্ট হইয়া, প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের গ্রন্থ সকল প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন, দৃষ্ট হইত।

তিনি কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্ত্বা প্রকাশ দ্বারা, কর্ম্ম স্থলের সমস্ত অধ্যক্ষগণের নিকট অবিলম্বে সবিশেষ পরিচিত হইলেন। কর্ণেল গল্‌ডি ও চ্যাম্পনিজ্‌ সাহেবের

প্রিয়পাত্র হইলেন। ঐ কর্ণেলদ্বয় সুযোগ পাইলেই, হরিশকে উচ্চ পদে উন্নত করিতেন। এমন কি তাঁহার নিযুক্ত হওয়ার বৎসর না ফিরিতেই ১০০৲ টাকা বেতন হইয়াছিল। ক্রমশঃ তিনি সহকারী মিলিটারি অডি-টরের সম্মানসূচক ও ভারবহ পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মধ্যে অনেক গোলযোগ যায়। হরিশ স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন; অধ্যক্ষগণের অন্যায় প্রভুত্ব সহিতে পারিতেন না। এক দিন কোন হিসাবে একটী ভুল দেখিয়া কর্ণেল চ্যাম্পনিজ্ তাঁহাকে তিরস্কার করেন। হরিশ দেখিলেন এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র দোষ নাই; অথচ প্রভু তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেছেন। প্রভুর অবিশ্বাস স্থলে চাকরী করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিলেন। কর্ণেল গল্ডি, দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। অনুস-ন্ধানে জানিতে পারিলেন হরিশের দোষ নাই; তখন তাঁহার আনন্দ হইল। সুতরাং, অতিরিক্ত তেজস্বিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া হরিশকে তখন চ্যাম্পনিজ্ সাহে-বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল; তিনিও লজ্জিত হইয়া ক্ষমা করিলেন। তাঁহারা হরিশকে যেরূপ ভাল বাসিতেন, এই আকস্মিক ঘটনা হওয়াতে তাহার কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। সাহেবেরা যত দিন এখানে ছিলেন, তাঁহার প্রতি সমান স্নেহ ও প্রণয় প্রকাশ করিতেন।

কুলীনের ছেলে বলিয়া ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বালীর উত্তরপাড়ায় গোবিন্দচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার একটী কন্যা হয় ;—কন্যাটী ৬ দিবসমাত্র জীবিত ছিল। পর বৎসর আর একটী পুত্র জন্মে। এই শিশুটী ১৫ দিবস বয়সে মাতৃহীন হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিয়া বাল্যবিবাহের বিষময় ফল দেখাইয়া যায়! পত্নি-বিয়োগের চারি মাস পরে, মামার অনুরোধে হরিশ পুনরায় বিবাহ করেন।

তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার বাসনা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল। সেনাসম্বন্ধীয় কার্য্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াই নানা প্রকারে অধ্যয়নের সুবিধা করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে ইংরাজী ভাষায় বেশ লিখিতে ও প্রস্তাব রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন। এই সময়ে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে যত সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইত, প্রায় সকল কাগজেই হরিশের লেখা দেখা যাইত। তিনি এরূপ লেখায় তৃপ্ত না হইয়া কোন সম্বাদ পত্রের সম্পাদক হইবার বাসনা করিলেন।

তদনুসারে "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার অধিকারী ও সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষের সহিত আলাপ করিলেন এবং কিছু দিন পরেই উহার এক জন প্রধান লেখক হইলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত

মনের মিল না হওয়াতে এবং সম্পাদক তাঁহার লিখিত কয়েকটী প্রস্তাব পত্রিকাস্থ না করাতে, তিনি ক্রমশঃ ঐ পত্রিকার উন্নতি সাধনে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে কলিকাতার কোন ক্ষমতাপন্ন ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি "বেঙ্গল রেকর্ডার" নামক এক খানি পত্রিকা প্রচার করিতে লাগিলেন।

"ইণ্টেলিজেন্সরের" সহিত সংশ্রব রাখা তাঁহার বিরক্তিকর হইয়াছিল; সুতরাং এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়া "রেকর্ডারের" সম্পাদক হইলেন। কিছু দিন পরে রেকর্ডার রহিত হইয়া "হিন্দু পেট্রিয়ট" নামক সম্বাদ পত্রের সৃষ্টি হইল। রেকর্ডারের গ্রাহকগণই ইহার গ্রাহক হইলেন এবং ইহার কর্ম্মচারীগণ ও হরিশ এই নূতন পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন। পেট্রিয়টের অধ্যক্ষ ইহার অকিঞ্চিৎকর লাভাঙ্ক দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং তিন বৎসরের মধ্যে হাজার কতক টাকা লোকসান দিয়া, ইহার স্বত্ব বিক্রয়ের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কোন স্বত্বক্রেতা উপস্থিত না হওয়াতে পত্রিকা প্রচার রহিত করিয়া, মুদ্রাযন্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ বিক্রয় করা স্থির হইল।

হরিশ, মিতব্যয়িতা গুণে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। "পেট্রিয়ট" প্রচারে লাভ হইতেছে না এবং আপনি উহার অবস্থা উন্নত করিতে পারিবেন কি না

তাহার ঠিক নাই, তথাপি উক্ত সঞ্চিত অর্থ দ্বারা উহার স্বত্ব ক্রয় করিলেন। যেহেতু, পেট্রিয়ট্টী এককালে রহিত হইয়া যায়, ইহা কোনরূপেই তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রমে পেট্রিয়ট্ অন্ততঃ আপন ব্যয়োপযোগী অর্থও উপার্জ্জন করিবে। সম্বাদ পত্র লিখিয়া, বিশেষ লাভের অভিলাষী ছিলেন না।

১২৬২ সালের (১৮৫৫ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে তাঁহার ভ্রাতার নামে কাগজ চালাইতে লাগিলেন। ছাপাখানা ও কার্য্যালয় ভবানীপুরে বাটীর নিকটে আনিয়া স্থাপিত করিলেন। ১২৬৪ সালের (১৮৫৭ খৃঃ) আষাঢ় মাসে ১০০৲ টাকা এবং অপর কয়েক মাসে কিছু কিছু লোকসান দিয়াছিলেন কিন্তু এই ক্ষতি, তিনি এরূপে সহ্য করিয়াছিলেন যে, তন্নিমিত্ত কেহ কখন তাঁহাকে বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখে নাই; বরং লোকে মনে করিত উহা হইতে তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। বাস্তবিকই ১২৬৪ সাল হইতে "পেট্রিয়ট্" পত্রিকার লাভের সূত্রপাত হয়। হরিশ, আপন বিদ্যা, বুদ্ধি ও শ্রম দ্বারা শেষে ইহাকে এক বিপুল লাভজনক ও দেশ বিখ্যাত পত্রিকা করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার প্রভু চ্যাম্পনিজ্ সাহেব, রাজনীতির আলোচনা ও প্রয়োজনীয় তাড়িত-বার্ত্তা সকল প্রকাশ করি-

ষার সুবিধার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। হরিশও এ সকল বিষয়ে তাঁহার ন্যায় অতিশয় অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন দেখিয়া, যে কোন তাড়িত-বার্ত্তা তাঁহার হস্তগত হইত, প্রতিদিন সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিতেন; তিনি তাহা যত্নপূর্ব্বক পেট্রিয়টে প্রকাশ করিতেন। ১২৬৩ সালে (১৮৫৬ খৃঃ) হরিশ অতিশয় শ্রম সহকারে সাবধান হইয়া কাগজ চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে সিপাহীরা ইংরাজদিগের বিদ্রোহী হইয়াছিল। সিপাহীদিগকে বিদ্রোহী হইতে দেখিয়া, সাহেবেরা মনে করিয়াছিলেন—কি বাঙ্গালি, কি হিন্দুস্থানি, ভারতবর্ষবাসি সমুদায় লোকই রাজবিদ্রোহি হইয়াছে। কেবল হরিশের লেখনীই তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে এই ভ্রম দূর করেন এবং বাঙ্গালিরা নিতান্ত নিরীহ ও রাজভক্ত, ইহা প্রতিপন্ন করেন। এই সকল কারণে পেট্রিয়ট্ অতি শীঘ্র সকলের আদরণীয় হইয়া উঠিল।

বিদ্রোহ-শান্তি হইলে, সেনানায়ক চ্যাম্পনিজ্ সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। হেলিংটন্ নামক অপর এক ব্যক্তি তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন। চ্যাম্পনিজ্ যখন প্রস্থান করেন, তখন হরিশ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া কহিলেন,—“হাজার টাকা মাহিনার ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর দ্বারা যেরূপ কায পাওয়া

যায়, আমার এই সকল দেশীয় কর্ম্মচারীরা দুই তিন শত টাকা বেতনে সেইরূপ কর্ম্ম করিতেছে। আমি এবং কর্ণেল গল্‌ডি বরাবর ইহাদিগের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছি, প্রার্থনা করি—আপনিও সেইরূপ রাখিবেন।” অনন্তর হরিশের উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইতে লাগিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হেলিংটন পূর্ব্বোক্ত সাহেবদের ন্যায় হরিশের প্রতি শিক্ষকতা বা বন্ধুত্ব ভাব প্রকাশ না করিয়া, অধিক প্রভুত্ব প্রকাশ করিতেন; কিন্তু মৌখিক স্নেহ প্রকাশেও ত্রুটি হইত না। হেলিংটনের চিত্ত অব্যবস্থিত ছিল। তিনি হরিশকে দুইবার পদচ্যুত ও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হরিশ নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, কর্ণেল হেলিংটনের লঘু-চিত্ততায় বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আরও একবার কর্ম্ম ত্যাগের প্রস্তাব করিতে হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই কর্ণেল গল্‌ডি ও চ্যাম্পানিজ্‌কে স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন।

হরিশ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভবানীপুরের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনিও, সে স্থানে মনোমত মিত্রগণের সহিত আলাপ ও লেখা পড়ার আলোচনা করিয়া অতিশয় প্রীত হইতেন বলিয়া, আপনাকে ভবানীপুরের নিকট ঋণী মনে করিতেন। বিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত হরিশ বন্ধুগণকে লইয়া ভবানীপুরে একটী

সভা করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সভায় উপস্থিত হইয়া কঠিন কঠিন শাস্ত্র সকলের আলোচনা করিতেন। এই সভায় ব্যবস্থা বিষয়িণী আলোচনাই অধিক হইত।

ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই, হরিশকে এক জন বড় লোক বলিয়া জানিতে পারিলেন। কয়েকটী বন্ধুও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইয়া প্রধান প্রধান সম্ভ্রমসূচক রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে রমাপ্রসাদ রায় এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত এই দুজনই অধিক বিখ্যাত। ইহাঁরা কিছু কাল সদর আদালতের ওকালতী করিয়া বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন; পরিশেষে সর্ব্ব প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি (হাইকোর্টের জজ) হইয়াছিলেন।

হরিশ ক্রমে ক্রমে নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় মনঃসংযোগ ও আনন্দের সহিত ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। গণিত শাস্ত্রেও বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইয়ুরোপীয় বড় বড় বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ সকলের সমালোচন করিয়া, পেট্রিয়টে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। তিনি কণ্ট ও হেমিলটনের রচিত মনোবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া অনেক উত্তমোত্তম বিষয় লিখিয়াছিলেন। ফলে, তিনি যেরূপ শিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে এক জন প্রধান বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের ক্ষমতার আদি বৃত্তান্ত ও ক্রম-বিস্তৃত শাসনপ্রণালী জানিবার নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের মহাসভার জমা খরচের হিসাব তাঁহার মুখে মুখে থাকিত। মহা-সভার পোকায় কাটা পুরাতন কাগজপত্র সকল বিশেষ মনোযোগ ও সহিষ্ণুতার সহিত পাঠ করিয়া, ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকারের ইতিহাস নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধান দ্বারা ভারত-বর্ষ ও ইংলণ্ড সম্বন্ধে তিনি এত অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে, ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের এক খানি ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, গ্রন্থ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। নীলকরেরা প্রজাগণের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার* করাতে প্রজারা "নীল করিব না" বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠে। এই সময়ে হরিশ বাবু আপন পেট্রিয়ট্ পত্রিকায় ঐ সকল অত্যাচার প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের গোচর করিতে লাগিলেন। নীলকর ও প্রজা—এই দুয়ের কোন্ পক্ষ দোষী, জানি-বার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী কমিসন নিযুক্ত করিলেন। এই সূত্রে এদেশের অনেক বড় বড় লোকের সাক্ষ্য

* 'নীলদর্পণ' নাটকে ইহার বিশেষ পরিচয় আছে।

গ্রহণ করা হয়। হরিশ ১২৬৭ সালে (১৮৬০ খৃঃ) ঐ সাক্ষ্য দেন। অনেক অনুসন্ধানের পর প্রজাদিগের প্রতিই অত্যাচার সপ্রমাণ হইল। ঐ প্রমাণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হরিশের দ্বারা অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। হরিশ পূর্ব্বাবধি, প্রজাগণের প্রতি নীলকরদিগের যে সকল অত্যাচার নিবারণ জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতে ছিলেন, ১২৬৮সালে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার উপায় হয়।

হরিশ বাবুর চরিত্র সম্পূর্ণরূপে লিখিতে গেলে বালকেরা বুঝিতে পারিবে না; এই নিমিত্ত স্থূলাংশ মাত্র লিখিত হইল।

তিনি প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি স্বভাবতই তেজস্বিনী ছিল। অনেকে প্রায় সকল বিষয়ই স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া যান; কিন্তু তিনি সেরূপ দেখিতেন না; যে বিষয়ই হউক, তন্ন তন্ন করিয়া আন্দোলন করিতেন। তিনি সকল বিষয়ই সম্যক্ অনুভব করিতে পারিতেন; কোন বিষয়ে অনবরত চিন্তা করিলেও তাঁহার বুদ্ধি কলুষিত বা ক্লিষ্ট হইত না। স্মৃতিশক্তিও বিলক্ষণ ছিল;—যাহা একবার চিত্তকোষে সংগ্রহ করিতেন, তাহা প্রায় কখনই হারাইতেন না। কোন বিষয়ের কিয়দংশ মাত্র দেখিলে বা শুনিলে, তাহার সবিশেষ ভাব বুঝিতে পারিতেন। রাজনীতি সম্বন্ধীয় নূতন ভাব অবগত হইবার জন্য নিরন্তর উৎসুক থাকিতেন।

তিনি অতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, বহু সংখ্যক সম্বাদ পত্রিকা পাঠ করিতেন এবং তাহার মধ্যে যে সকল ভাল ভাল বিষয় থাকিত, স্বয়ং সংগ্রহ করিতেন। অথচ সেই সময়ে যে সকল বন্ধু ও অর্থী উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদিগের সঙ্গেও বেশ কথা বার্ত্তা চলিত। দশটা বাজিবা মাত্র সত্বর আহার করিয়া আফিসে যাইতেন। পাঁচটা বা কোন কোন দিন তদপেক্ষা অধিক কাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া সে স্থান হইতে বহির্গত হইতেন। আফিস হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর সাধারণ পুস্তকালয়ে গমন করিতেন; সেখানে যদি কোন নূতন পুস্তক বা পত্রিকা উপস্থিত থাকিত, শীঘ্র শীঘ্র পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় সভায় * গমন করিতেন। সেখানে, যে রাশীকৃত লেখা পড়ার কাগজ থাকিত, তাহা সারিয়া, রাত্রি ১০।১১টার সময় বাড়ী আসিতেন। অতঃ-

* কলিকাতা নগরে এদেশীয় প্রধান লোকদিগের একটী সভা আছে। ভারতবর্ষের অনিষ্ট নিরাকরণ ও হিতসাধনের নিমিত্ত, যদি অত্রত্য গবর্ণমেণ্টে কি ইংলণ্ডীয় মহাসভায় কিছু জানাইবার আবশ্যকতা হয়, প্রায় এই সভাই জানাইবার চেষ্টা করেন। ফলতঃ সর্ব্বোপায়ে ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন করাই এই সভার উদ্দেশ্য। ইহা "ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্" বলিয়া খ্যাত। হরিশ বাবু এই সভার কার্য্যকারী বিভাগের এক জন সভ্য ছিলেন। তিনিই এই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী।

পর বন্ধুগণকে লইয়া কিয়ৎক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করিতেন। এতদ্ভিন্ন কাগজ ছাপিবার দিন সমস্ত রাত্রি জাগিতেন। যে পেট্রিয়ট্ পত্র তাঁহাকে এত গৌরবান্বিত করিয়াছিল, সপ্তাহের মধ্যে তিনি দু দিনও তাহাতে হাত দিতে পাইতেন না। পূর্ব্বোক্ত নিরূপিত পরিশ্রমের পর ছাপিবার রাত্রিতেই লিখিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভ পূর্ণ করিতেন। তাঁহার পরিশ্রমের কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি প্রথমাবস্থায় প্রতিদিন প্রায় ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া ভবানীপুর হইতে হেদুয়া দীঘীর (কর্ণওয়ালিস্ স্কয়ারের) ধারে ডাক্তার ডফ্ সাহেবের মনোবিজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ শুনিতে যাইতেন।

স্বাবলম্বনই তাঁহার প্রধান গুণ। তিনি কোন বিষয়েই কাহার সাহায্য লইতেন না—আপনিই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। রাজনীতি ও ব্যবস্থা বিষয়ে তিনি এমন জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, বড় বড় সদর আমীন ও মুন্সেফগণ তাঁহার বাড়ীতে গিয়া আইন ঘটিত জটিল বিষয় সকলের মীমাংসা করিয়া লইতেন। তাঁহার বিচারশক্তি এমন সুন্দর ছিল যে, শত্রুরাও তাঁহাকে প্রশংসা করিত। একবার দেশীয় লোকেরা কোন বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে মনোনীত করিয়াছিলেন ; তিনি মাতৃ অনুরোধে যাইতে পারেন নাই।

তিনি প্রকৃত সৎ ও মহৎ ছিলেন। পরোপকার সাধনই

তাঁহারজীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। তাঁহার মনে অপরিমেয় সাহস ও বল ছিল। দুর্ব্বল ও নিরাশ্রয়দিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কতই যে বলবান্ ও ক্ষমতাশালী লোককে শত্রু করিয়াছিলেন সংখ্যা করা যায় না! তাঁহার জীবনকালে সাহায্য-প্রার্থিদিগকে কিছুই করিতে হইত না;—কেবল একবার ভবানীপুর গেলেই হইত,—সেখানে হিতব্রত হরিশ পরোপকারে প্রস্তুত থাকিতেন।

তিনি যে, কেবল কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের উপকারী ছিলেন এমত নহে,—সাধারণের উপকারী ছিলেন। কোন সময়ে এক জন প্রধান লোক তাঁহাকে সদরের ওকালতী কিম্বা বাণিজ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। হরিশ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় সময়ই ঐ কার্য্যে যাইবে,—পরের কার্য্য করিতে অবকাশ পাইবেন না। কখন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট সাহায্য বা উপদেশ প্রার্থনা করিয়া বিফল হয় নাই। পরের দুঃখ ঘুচাইবার যে কোন উপায়, তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল, তিনি তাহা অবাধে অবলম্বন করিতেন।

তিনি যেমন উদারচিত্ত, তেমনি মুক্ত-হস্ত ছিলেন। কোন সময়ে এক জন সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদ্যপি কোন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিত্বপদ পাও, তথাপি নিজে যে রাজ্যের (পেট্রিয়ট্) সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা ত্যাগ করিও না।" কিছু দিন পরে তাঁহার নিমিত্ত

একটী উচ্চ পদ উপস্থিত হইলে, তিনি উক্ত সাহেবকে বলিয়াছিলেন "তুমিই জয়ী"। অর্থাৎ পাছে পেট্রিয়টে মনোযোগ করিতে না পারেন এই জন্য ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পেট্রিয়ট্ অর্থে দেশহিতৈষী; তিনি ঐ পত্রিকার নাম সার্থক করিয়াছিলেন।

পাঠকগণ, হরিশবাবু কি ভাবে আপন গৃহে অবস্থিতি করিতেন, আমি তোমাদিগের তাহার এক চিত্র দেই। ঐ দেখ! অত্যাচার পীড়িত প্রজাগণকে বিচারালয়ে যাইবার জন্য দরখাস্ত লিখিয়া দিতেছেন;—আবশ্যক খরচের জন্য টাকা দিতেছেন;—ক্ষমতাশালী লোকদিগের নিকট হইতে সাহায্য দেওয়াইবার উপায় করিতেছেন এবং উপদেশ দিয়া উহাদিগকে সদ্বিচার লাভে সমর্থ করিতেছেন। আবার ঐ দেখ! রোরুদ্যমান রাইয়তগণে তাঁহার বাড়ী কোলাহলময় করিয়াছে;—তিনি অবাক্ হইয়া উহাদের দুঃখ কাহিনী শুনিতেছেন;—তাঁহার চক্ষুর্জল রাইয়তদের রোদনে উত্তর দিতেছে;—উহাদিগকে আপনার বিপন্ন ভ্রাতৃগণ মনে করিয়া পরম যত্নে আহারাদি করাইতেছেন এবং উহাদিগের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব দানের সঙ্কল্প করিতেছেন। আবার এ দিকে দেখ! নিরুপায় পরিচিত ব্যক্তিকে লইয়া গিয়া নিস্তব্ধভাবে অর্থ দান করিতেছেন;—আপনার শরীর দিয়া পল্লীর অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বা-

পান করিতেছেন;—বিপদাপন্ন প্রতিবেশির বিপদুদ্ধার বিষয়ে আপনার সমগ্র ক্ষমতা নিয়োজিত করিতেছেন,—অত্যাচারির দণ্ডবিধানের নিমিত্ত বিপুল সাহসে নির্ভর করিয়া যথোপযুক্ত যত্ন করিতেছেন এবং পীড়িত বন্ধুর শয্যায় বসিয়া সমান দুঃখানুভব করিতেছেন।

তিনি মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য সাধনে আত্মা ও মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি যে অবস্থায় আফিসের কার্য্য করিতেন—অন্যে সে অবস্থায় শয্যাগত থাকে। এই অতিশ্রমই তাঁহার মৃত্যুকে সত্বর আহ্বান করিয়াছিল। তিনি সেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াও কি জন্য অবকাশ লন নাই, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া তিনিই তাহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন। তাহা এই, "বাঙ্গালিরা প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারে ইহা আমার উচ্চপদস্থ ইংরাজ প্রভুগণকে দেখাইবার জন্যই আমি বিদায় লই নাই।" নীলকর পীড়িত প্রজাগণের দুঃখ দূর করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া তিনি কত কষ্টই ভোগ করিয়াছেন! এক দিকে নীলকর সাহেবেরা শাসাইতেছেন; আর দিকে আদালত হরিশের বিপক্ষে ডিক্রী দিতেছেন; চারি দিকে সম্বাদ পত্র সকল তাঁহার নিন্দা ও গ্লানি করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন, কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অবিচলিত ও নিঃশঙ্ক চিত্তে নীলপ্রধান প্রদেশের

অত্যাচার-মূলক স্বরূপ-বিবরণ সকল সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে তিনি আপন ব্যয়ে, স্থানে স্থানে সম্বাদ সংগ্রাহক পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহার অন্তঃকরণ হিতময়, নিরহঙ্কার, ও উন্নতিশীল ছিল। কি বিদ্যা, কি ধন, কি কর্ম্ম কোন বিষয়েই তাঁহার আড়ম্বর ছিল না। লোকের প্রতি আশার অতিরিক্ত সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি বস্তুতই যে প্রকার ছিলেন, ভাবভঙ্গী দ্বারাও কখন কাহাকে তাহার অন্য-রূপ দেখান নাই। তিনি জন্মভূমিকে জননীর ন্যায় দেখিতেন। তিনিই যথার্থ দেশহিতৈষী ছিলেন। কেমন করিয়া লোকের ভাল করিতে হয়—তিনিই জানিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি যে, কেবল রাজনীতি ও অপরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন এমন নয়;—ধর্ম্মালোচনাতেও তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। এত কাযের মধ্যেও ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের জন্য বক্তৃতা লিখিতেন এবং ঐ সভার উন্নতির নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিতেন।

তিনি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও দুঃখির হিতচিন্তায় নিবৃত্ত ছিলেন না। যখন শুনিলেন ষ্টেট্ সেক্রেটারি সর্ চার্লস্ উড্ * রাইয়তের পক্ষে নীল মোকদ্দমার

---

* ভারত রাজ্যের তৎকালীন সর্ব্ব প্রধান অধ্যক্ষ। ইনি ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন।

যথাযোগ্য মীমাংসা করিয়াছেন, তখন সেই মুমূর্ষু অবস্থায় আপনাকে সুখী ও কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, যেন এই কথা শুনিবার জন্যই সে অবস্থায় কয়েক দিন জীবিত ছিলেন। যখন শুনিলেন, তিনি গৌরবান্বিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, সেই অমনি, অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদে গদ্গদ হইয়া আত্মাকে চির শান্তিতে সমর্পণ করিলেন। আহা! তৈল নিঃশেষিত হইলে, দীপশিখা যেমন সমুজ্জ্বল হইয়া, তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হয়, —জীবনপ্রয়াণকালে হরিশ্চন্দ্রের মুখমণ্ডল, তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া, নীলিমায় আচ্ছন্ন হইল!!!

নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম-দোষে, মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই হরিশ বাবু পীড়িত হন; ক্রমে সেই রোগ প্রবল ও বদ্ধমূল হওয়াতে, শয্যাশায়ী হইলেন। হায়! কি অশুভক্ষণেই শয্যাগত হইলেন! সেই শয্যা তাঁহার অনন্তশয্যা হইল! উঃ! যে দিন, হরিশ বাবু চির-নিদ্রায় অভিভূত হন;—যে দিন, তাঁহার শেষ নিশ্বাস-অগ্নিতে, নীলকরগণের উপদ্রব-জঞ্জাল-রাশি ভস্মীভূত হইয়া বঙ্গভূমি পবিত্র হয়;—যে দিন, তাঁহার বিরহ-রূপ, ভারতের দুষ্পরিহর ক্ষতি সংঘটিত হয়; সেই—১২৬৮ সালের ১২ই আষাঢ়—কি শোকাবহ!

বালকগণ, একবার দেখ! হরিশ বাবু কেমন লোক! তিনি এক জন সামান্য ব্রাহ্মণের ছেলে; শুদ্ধ আপনার

শ্রম ও যত্নে এত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে ৪০০ ্ শত টাকা বেতন হইয়াছিল। যদি তাঁহার দেশহিতৈষিতা গুণটী অত বলবতী না হইত, তাহা হইলে, তিনি ধনে মানে আরও উন্নত হইতে পারিতেন। কেবল জ্ঞানার্জ্জন ও সাধারণের হিতসাধনের অবকাশ কম হইবে বলিয়াই তিনি অন্য ব্যবসায়ে যান নাই। তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ-কর্ত্তা কি প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন না, তিনি মিলিটারি আফিসের এক জন কেরাণী মাত্র ছিলেন। কিন্তু, তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি আত্মবঞ্চনা, বিদ্যাশিক্ষা, বিলাসবিদ্বেষ, স্বাধীন-তেজস্বিতা, এবং পরোপকার দ্বারা মনুষ্যের আদর্শ হইয়াছিলেন। মনুষ্যকে কি করিতে হইবে এবং কি ভাবে চলিতে হইবে, এই বিষয়ে তিনি আমাদিগের মনে এমন একটী ভাব উত্তেজিত করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা চিরকালে নষ্ট হইবে না। যাঁহারা লেখা পড়া জানেন তাঁহারা ত জানিতেছেনই যে হরিশ বাবু এক জন প্রধান দেশ-হিতৈষী লোক ছিলেন এবং পৃথিবীতে যত দিন লেখা পড়ার আলোচনা থাকিবে, তত দিন সকলেই জানিতে পারিবেন তিনি এক জন প্রধান দেশোপকারী লোক ছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকার চেষ্টা, কার্য্যে এমন পরিণত হইয়াছিল যে,

তাঁহার জীবনকালে শত শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী পর্ণকুটীর বাসী নিরক্ষর কৃষকগণও জানিতে পারিয়াছিল যে, ভবানীপুরে তাহাদের এক জন বিপদ্-বন্ধু আছেন। চাষারা গান (১) বাঁধিয়া তাঁহার গুণ ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। আহা! হরিশ বাবুর জীবন-পথের যে অংশ পৃথিবীর উপর দিয়া গিয়াছে তাহা কি মহৎ! আহা! কি মনোহর!

---

(১) কোন নীল-কুঠীতে হরিশ নামে এক জন অত্যা-চারী দেওয়ান ছিলেন; তাঁহাকে এবং উপরোক্ত হরিশকে লক্ষ্য করিয়া চাষারা এইরূপ গান করিত;—

"ভাসছে মন মনের হরিষে।
(আগে) লুটে খেত এক হরিশে;
(এখন) বাঁচালে এক হরিশে;
বুনে বুনে নীল, কর্ত্তো জমী খীল,
(এখন) হতেছে তায়, অড়র কলাই, সরিষে॥" ইত্যাদি।